বনের আসর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৩
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা—১২
ছেপেছেন
গৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলকাতা—৬
প্রচ্ছদ ও ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী

অমিতাভকে

বাবা

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের উপযোগী অন্যান্য বই :

সিকেপিকেটিকে	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পিনডিদার গপ্পো	"
চিরকালের উপকথা	শংকর
এক ব্যাগ শংকর	শংকর
দুনিয়ার ঘনাদা	প্রেমেন্দ্র মিত্র
পাতার বাঁশি	কার্তিক ঘোষ
সেনাপতি নিরুদ্দেশ	প্রফুল্ল রায়
দুষ্টু টুসটুসি	গিরিধারী কুণ্ডু
বুলাই	"
যত ঝকি যত ঝামেলা	মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অক্ষরে অক্ষরে	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সোনার সুটকেস	ফণীভূষণ আচার্য
কাঠি নিয়ে কঠিন খেলা	অরূপরতন ভট্টাচার্য
সংখ্যার অসংখ্য খেলা	"
বৈঠকী ধাঁধার খেলা	"
ধাঁধা নিয়ে মজার খেলা	"
ভয় ভুতুড়ে	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক	"
টোরাদ্বীপের ভয়ংকর	"
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ	সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানী চরিতকথা	"
হাসতে হাসতে খুন	পূর্ণেন্দু পত্রী
ছোটদের বিদ্যাসাগর	সুনির্মল বসু

বনের আসর

এই লেখকের ছোটদের বই :

কলকাতার কেঁদো
আমাজনের অরণ্যে
নান্টুমামার গাড়ি
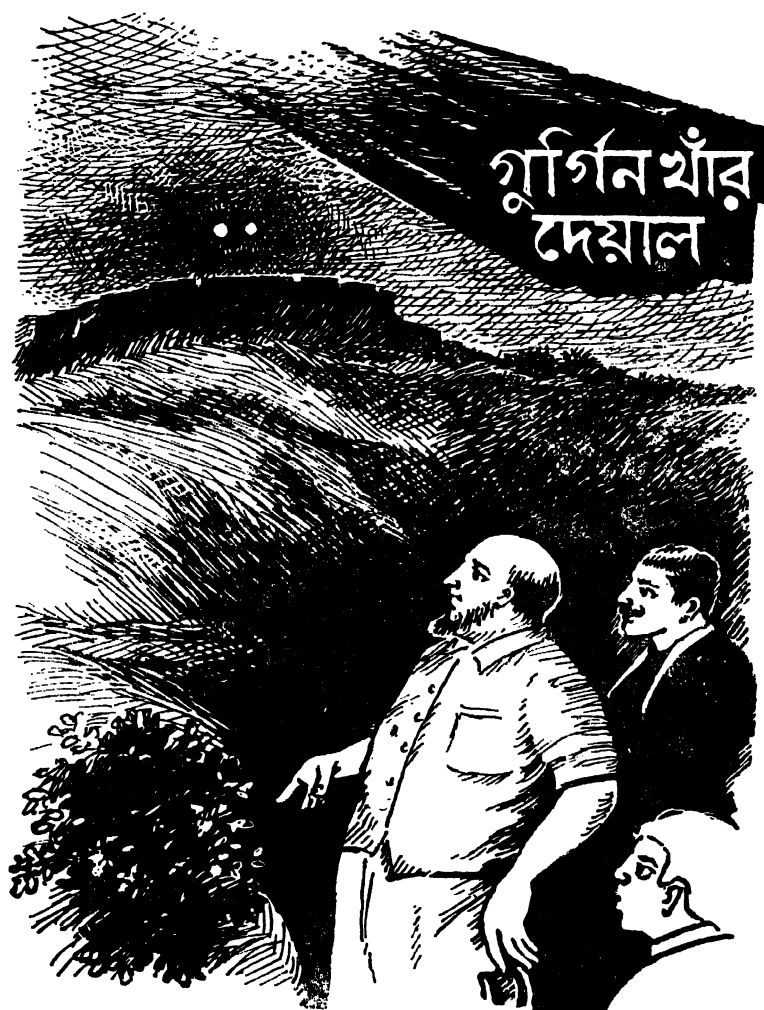
জিপ থেকে নেমেই আমরা মাঠের দিকে তাকালুম। চোখে পড়ল সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক দেয়াল—যেটা দেখতেই চলে এসেছি এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়। অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। ওই সেই রহস্যময় দেয়াল—যেখানে অদ্ভুত সব আলো আর ছায়ামূর্তি

দেখা যায় নিশুতি রাতে। কারা চেরা গলায় বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। শুনলে মহাদুঃসাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আমার একা আসার ক্ষমতা ছিল না। প্রাণ গেলেও আসতুম না। অথচ চাকরি করি খবরের কাগজে। রিপোর্টার আমি। তাই আর সব কাগজে যখন খবরটা বেরিয়ে গিয়েছিল, আমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক তেড়েমেড়ে আমাকেই বললেন – জয়ন্ত কি বেঁচে আছ, না তুমিও ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? সবাই এমন একটা সাংঘাতিক খবর ছাপিয়ে তাক লাগিয়ে দিল, আর আমরা বসে গাল চুলকোতে থাকলুম? আজই বেরিয়ে পড়ো। সবাই শুধু খবরটাই ছেপেছে, আমরা ছাপব এর পেছনের রহস্যটা আসলে কী। বুঝেছ তো?

প্রথমে যা খবর বেরিয়েছিল, তা অনেকেই গাঁজাখুরি বলে মেনেছিলেন। কিন্তু পরে যখন আজমগড়ের পুলিস সুপার স্বচক্ষে দেখে এসে সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা দিলেন, তখন আর তা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। পুলিসকে ভূতপ্রেতও ভয় পায়। সেই পুলিসের লোক যখন বলছে, তখন ঘটনা নিখাদ সত্যি।

পুলিস সুপার মিঃ দীক্ষিত স্থানীয় লোকের কাছে যা শুনেছিলেন, তা গুজব ভেবেছিলেন। তবু একটা তদন্ত করা তো দরকার। তিনি সেই জনমানুষহীন মাঠে তাঁবু ফেলে পরপর তিনটে রাত জেগে কাটান। তারপরের রাতে সেই ভূতুড়ে কাণ্ড দেখতে পান। দেয়ালের ওপর দুটো জ্বলজ্বলে লাল চোখের মতো আলো দেখা যায়। টর্চ জ্বেলে তিনি চমকে ওঠেন। একটা কংকাল নাকি নাচছে। তারপর বিকট আর্তনাদ শোনেন। অসংখ্য ছায়ামূর্তি ছুটোছুটি করতে থাকে পাঁচিলের কাছে। বন্দুক ছুড়তেই অবশ্য সব থেমে যায়। আলো নিভে যায়। ভৌতিক কাণ্ডটা আর ঘটে না। খুঁটিয়ে দিনের আলোয় সব দেখেছেন মিঃ দীক্ষিত। কিন্তু কোন হদিস পান নি। অত উঁচু পাঁচিলে অবশ্য ওঠেন নি – ওঠা সম্ভব ছিল না।

তারপর যথারীতি সরকার একদল বিজ্ঞানী পাঠিয়েছিলেন

সেখানে। তাঁদের বরাত—পরপর সাত রাত জেগেও কিছু দেখতে পান নি। তখন তাঁরা পুলিস সুপারকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে রিপোর্ট পাঠান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মিঃ দীক্ষিতের অবস্থা তখন শোচনীয়। চাকরি যায়-যায় আর কি!

সত্যসেবক পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকের তাড়া খেয়ে আমি যখন আজমগড় যাওয়া ঠিক করে ফেলেছি, তখন হঠাৎ ইলিয়ট রোড থেকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফোন পেলুম।—হ্যাল্লো জয়ন্ত! জরুরী দরকার। এক্ষুণি চলে এস।

অমনি আমার মাথা খুলে গেল। আরে তাই তো! কর্নেলের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলুম! এসব ব্যাপারে এই ধূর্ত বুড়ো ঘুঘুর সাহায্য নেওয়া যায়। উনি সামরিক বিভাগে একসময় চাকরি করতেন। যুদ্ধে গেছেন। কত সব রোমাঞ্চকর কীর্তি করেছেন। এখন অবসর জীবনে নানান হবি নিয়ে থাকেন। যেমন—দুর্লভ জাতের পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় খুঁজে বেড়ানো, পাহাড়ে-জঙ্গলে সমুদ্রে ঘোরাঘুরি। তবে এখন ওঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় উনি প্রাইভেট গোয়েন্দা। নিতান্ত শৌখিন গোয়েন্দা আর কী! ধুরন্ধর কর্নেল এ আব্দি যে কত খুনী আর চোরডাকাত ধরতে সরকারকে সাহায্য করেছেন, তার সংখ্যা নেই। যেখানে রহস্যের গন্ধ, সেখানেই এই ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো ঝেঁচে পড়ে নাক গলাবেন—এই ওঁর অভ্যাস। এই দাড়ি ও টাকওয়ালা বুড়োর খ্যাতি পুলিসমহলে অসাধারণ।

এমন মানুষ থাকতে আমি ভেবে মরছিলুম! তক্ষুনি ওঁর বাসায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, এক অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি কথা বলছেন। ভদ্রলোকটির বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। খুব স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা। সিভিল পোশাকে ছিলেন বলে জানতেও পারি নি যে উনিই আজমগড়ের সেই পুলিস সুপার মিঃ রামধন দীক্ষিত!

ব্যস। তারপর আর কী! আকস্মিক যোগাযোগ এমনটি আর দেখা যায় না। আমরা পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলুম।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের আজমগড়ে পৌঁছতে আমাদের দুপুর লেগেছে। সেখানে মিঃ দীক্ষিতের কুঠিতে বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া সেরে অকুস্থলে পৌঁছেছি, তখন বিকেল চারটে।

সময়টা শীতের। বাপ্‌স্! কী শীত কী শীত! বিহারের মাঠে দিনে হাঁড়কাপানো এমন শীত যখন, তখন রাতে কী অবস্থা হবে ভেবে ঘাবড়ে গেলুম। জিপে তাঁবু ও রান্নার সরঞ্জাম আনা হয়েছে। একজন রান্নার লোক রয়েছে—তার নাম মাধোরাম। আর আছে জনা চার সশস্ত্র সেপাই।

ওভারকোটটা কেন আনি নি তাই ভাবছি, দেখি কর্নেলবুড়ো দিব্যি বাদামী রঙের বুশ শার্ট প্যান্ট পরে ঘুরছেন। মাথায় শুধু লাল রঙের টুপি। শীতের বাতাস বইছে প্রচণ্ড। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উনি চোখে বাইনাকুলার রেখে দেয়ালটা দেখছেন। আশ্চর্য বুড়ো!

একটা শুকনো নদীর তলায় আমাদের তাঁবু খাটানো হচ্ছে। জিপটা ঢালু পাড় গড়িয়ে নামাতে অসুবিধে হয় নি। ওপারে উঠে উঁচু জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেয়ালটা দেখছি। আন্দাজ ছ'সাতশো মিটার দূরে একটা বিশাল স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালটা। গুগিন খাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কে এই গুগিন খাঁ? কর্নেল তাও জানেন। মোগল আমলের এক দুর্ধর্ষ শাসনকর্তা। তাঁর ছেলের নাম ছিল আজম খাঁ। যার নামে ছ'মাইল দূরের ওই শহর আজমগড়। আর এই দেয়ালটাকে লোকে বলে 'গুগিনখাঁয়ের দেয়াল।' দুর্গের সব ভেঙেচুরে গেছে। শুধু এই ষাট ফুট লম্বা বিশ ফুট উঁচু একটা মাত্র পাথুরে দেয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে অবাক লাগে।

আশেপাশে অনেক ঢিবি আছে। ধ্বংসাবশেষ আছে। ঝোপ-ঝাড়ও প্রচুর। কিছু ক্ষয়াখর্বুটে গাছও চোখে পড়ল। তার ওধারে ধূ ধূ মাঠ। দূরে কিছু পাহাড়। কাছাকাছি কোন বসতি দেখতে পেলুম না। শুনলুম একদল রাখাল গোরু-মোষ চরাতে একটা বাথান করেছিল ওখানে। তারাই প্রথম ভূতুড়ে কাণ্ডটা দেখে এবং পালিয়ে

যায়। তারপর থেকে দিনদুপুরেও কেউ এদিকে পা বাড়ায় না। কোন কোম্পানি সীসের খনির খোঁজে এসেছিল। রাতারাতি তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

কর্নেল বাইনাকুলারে চোখ রেখে দেয়ালটাই হয়ত দেখছিলেন। মিঃ দীক্ষিত ও আমি কথা বলছিলুম। শীতের বেলা হু-হু করে পড়ে যাচ্ছে। শীগগির অন্ধকার এসে যাবে। আজ বরং অপেক্ষা করা যাক। কাল সকালে ওখানে গিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। আমরা দুজনে এসব কথাই আলোচনা করছিলুম। হঠাৎ দেখি, কর্নেল এগোচ্ছেন। মিঃ দীক্ষিত বললেন—এখনই যাচ্ছেন নাকি? উনি কোন জবাব দিলেন না। যেন সম্মোহিতের মতো চোখে দূরবীনটা রেখে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি একটু হেসে চাপা গলায় বললুম—যাক্ না বুড়ো। ভূতে ঘাড় মটকে দেবে। মিঃ দীক্ষিত হাসলেন। কিন্তু মুখটা কেমন করুণ দেখাল। বললেন—আসুন জয়ন্তবাবু। আমরাও যাই।

অগত্যা আমরা দুজনেও পা বাড়ালুম। তারপর অবাক হয়ে দেখি, বুড়ো দৌড়তে শুরু করেছেন। আমরা পরস্পর তাকাতাকি করলুম। আমরাও দৌড়াব নাকি? কিন্তু দেখতে দেখতে ততক্ষণে কর্নেল ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য। তখন আমরা হন্তদন্ত ছুটলুম।

ঝোপঝাড় পেরিয়ে খানিকটা, ফাঁকা জায়গা। বড় বড় পাথর পড়ে আছে। কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। বেমালুম উবে গেলেন যে! মিঃ দীক্ষিত ডাকলেন—কর্নেল! কর্নেল সাহেব! কোন সাড়া এল না। বললুম—ছেড়ে দিন। বুড়োর স্বভাবই এরকম। ঠিক এসে পড়বেন'খন।

তখন সূর্য ডুবছে। শীতও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গেলাম সেই দেয়ালটার কাছে। উঁচু ঢিবির ওপর সেটা রয়েছে। তাকাতেই আমার গা শিউরে উঠল। মনে হল দেয়ালটা যেন হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়। ঢিবির ওপর ওঠা শুরু করলুম। সেই সময় মিঃ দীক্ষিত

মনে পড়িয়ে দিলেন—আমাদের সঙ্গে টর্চ নেই।

অতএব বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। ঢিবিতে উঠে দেখলুম একটা প্রশস্ত পাথরের মেঝে। ফাটলে ঘাস গজিয়ে আছে। সামনে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দেয়ালটা আন্দাজ বিশ ফুট উঁচু। মনে হল, ওটা কম-পক্ষে দু'গজ চওড়া। সুতরাং ওর ওপর দৌড়াদৌড়ি করা সম্ভব বই-কি। এক জায়গায় একটা মস্তো ফাটল দেখছিলুম। সেখানে একটা শুকনো কোন গাছের গুঁড়ি ও শেকড় মেঝে অব্দি নেমে এসেছে। গাছটা যেভাবেই হোক, মারা গেছে কবে এবং ডগার দিকটা ক্ষয়ে ভেঙে গেছে সম্ভবত। দীক্ষিত বললেন—দেখুন জয়ন্তবাবু, মনে হচ্ছে—কেউ ইচ্ছে করলে ওই গাছটা বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠতে পারে। তাঁকে সায় দিলুম।

কিন্তু কর্নেল গেলেন কোথায়? দীক্ষিত আবার ডাকলেন—কর্নেল! কর্নেল সায়েব! অমনি সেই ডাকটা দ্বিগুণ জোরে প্রতিধ্বনি তুলল। উনি বললেন—দেখছেন জয়ন্তবাবু? দেয়ালটা কেমন প্রতিধ্বনি তোলে?

বললুম—হ্যাঁ। ঐতিহাসিক দালানগুলো দেখেছি এ ব্যাপারে ওস্তাদ। সবখানে এটা লক্ষ্য করেছি। আমার ধারণা, সেকালের স্থপতিরা কোন কৌশল জানতেন। তুঘলকাবাদে……

আমার মুখের কথা শেষ না হতেই কর্নেলের চিৎকার শুনলুম—মিঃ দীক্ষিত! জয়ন্ত! হেল্প্! হেল্প্! বাঁচাও! বাঁচাও!

চকিতে আমরা আওয়াজ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি ঢিবির উত্তর দিকের ঝোপ-ঝাড়ের ওপরে কর্নেল একটা কাঁটা গাছের ডগায় চড়ে রয়েছেন এবং মাথার টুপিটা জোরে নাড়ছেন। ব্যাপার কী? চেঁচিয়ে উঠলুম—কী হয়েছে কর্নেল?

কর্নেল পালটা চেঁচিয়ে বললেন—সাবধান জয়ন্ত! এগিও না। যাচ্ছে—তোমাদের দিকে যাচ্ছে!

আমরা হতভম্ব। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখি, ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড কালো ষাঁড় শিং নাড়তে নাড়তে ঝোপঝাড় ভেঙে আমাদের

দিকে এগিয়ে আসছে। অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি দৌড় লাগালুম। আছাড় খেলুম বারকতক। হাত-পা ছড়ে গেল নিশ্চয়। ঢিবি থেকে নেমে আর পিছন ফিরেও তাকালুম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লুম। সেই সময় কানে এল গুলির আওয়াজ। ঘুরে দেখার সাহসও হল না। একেবারে নদীর তলায় গিয়ে পড়লুম। সেপাইরা ব্যস্ত হয়ে বলল—ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া বাবুজী?

আঙুল তুলে দেয়ালের দিকটা দেখালুম শুধু। ওরা বন্দুক বাগিয়ে তক্ষুনি দৌড়ে চলে গেল।

কিন্তু অমন ষাঁড় ওখানে এল কোত্থেকে? এ তো ভারি বিদঘুটে ব্যাপার! নাকি আসলে ওটা একটা ভূতপ্রেত! রাঁধুনী লোকটা স্টোভ জ্বেলে কেটলিতে জল গরম করছিল। সভয়ে বললে—কুছ দেখা বাবুজি? কৈ পেরেত বা?

জোরে মাথা নাড়লুম। শীত চলে গিয়ে ঘাম দিচ্ছে যেন। হাঁফানি থামছে না। একটু পরে কথাবার্তার আওয়াজ পেলুম। তখন দিনের আলো আর নেই। টর্চ জ্বালতে-জ্বালতে দীক্ষিত, কর্নেল ও সেপাইরা আসছিল। দীক্ষিতের কথা শুনতে পেলুম—হ্যাঁ, আমার ধারণা, আপনার লাল টুপিটাই ষাঁড়টাকে রাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য! ওখানে ষাঁড় এল কোত্থেকে? রাখালরা তো এক মাস আগে গোরু-মোষ নিয়ে পালিয়ে গেছে। কর্নেল বললেন—সম্ভবত, ওদের দলের একটা ষাঁড় দলছুট হয়ে থেকে গেছে ওখানে। দীক্ষিত বললেন—তাও বটে।

আমার কাছে কর্নেল এসে বললেন—হ্যাল্লো জয়ন্ত! আশা করি, হাড়গোড় ভাঙেনি?

তখন হেসে উঠলুম।—আশা করি, আপনিও অক্ষত আছেন।

—আছি বৎস! কিন্তু—ওঃ! হরিবল, জয়ন্ত! আশ্চর্য বটে!

—হঠাৎ ষাঁড়ের পাল্লায় পড়তে গেলেন কেন? দৌড়েই গেলেন দেখছিলুম!

কর্নেল বিমর্ষ মুখে বললেন—দূর থেকে ওটাকে চিনতে পারিনি।

যেই দৌড়ে গেছি—ব্যস !

দীক্ষিত বললেন—লাল টুপি ! ওতেই ষাঁড়টা ক্ষেপে যায়। যাক্ গে, গুলির আওয়াজে ব্যাটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় বলেই রক্ষে। কিন্তু কর্নেল, এ তো এক সমস্যায় পড়া গেল। ওখানে গেলেই তো ব্যাটা আবার তেড়ে আসবে।

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন—হ্যাঁ। তা তো আসবেই। তবে যা বোঝা গেল, গুলির আওয়াজে বড্ড ভয় পায় ব্যাটা। তেমন দেখলে বরং আমরা তাই করব।

হ্যাসাগ জ্বালা হল। ক্যাম্পচেয়ার পেতে বসে আমরা কফি খেতে থাকলুম। রাত জাগতে হবে। কত রাত জাগতে হবে, জানি না। ভূতগুলোর মর্জি তো ! কোন্ রাতে তাদের খেলা শুরু হবে, তার ঠিক তো নেই !

কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতেই আমার এত ভয় হল যে অন্য কথা ভাবতে থাকলুম।......

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁবুর সামনে যে আগুন জ্বালা হয়েছিল, কিছুক্ষণ আমরা তার উত্তাপ নিলুম। তিনটে তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটা তাঁবুতে মিঃ দীক্ষিত ও রাঁধুনী মাধোরাম, অন্য একটায় সেপাই চারজন, আরেকটায় আমি ও কর্নেল শোব। শোব বলা ভুল হল। শোবার ভাগ্য আর মাত্র ঘণ্টা তিনেক। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি ঠিক রাত একটার পর ঘটতে থাকে। অতএব তখন আমাদের সেই প্রচণ্ড শীতেই বেরোতে হবে। নদীর পাড়ে যেতে হবে। জায়গা দেখে রাখা হয়েছে আগেই। তারপর কী করতে হবে, সে নির্দেশ কর্নেল দেবেন।

ছুটো ক্যাম্প খাটে পাশাপাশি শুয়েছি কর্নেল ও আমি। তিনটে কম্বলেও শীত যাচ্ছে না। তাই ঘণ্টা তিনেক ঘুমোবার সুযোগ হল না। দেয়ালটা আমাদের উত্তরে—সেদিকেই নদীর পাড়। এখান থেকে দেখা যায় না। আর তাঁবুর দরজা স্বভাবত দক্ষিণে।

দরজায় পর্দা ঝুলছে। একদিকে সামান্য ফাঁক। তাকিয়ে আছি সেদিকে। আকাশের দু-একটা নক্ষত্র চোখে পড়ছে। কর্নেলের রীতিমতো নাক ডাকছে। হঠাৎ দরজার ফাঁকের নক্ষত্র ঢেকে গেল। তারপর চাপা খসখস শব্দ কানে এল। শব্দটা ভাল করে শোনার জন্যে কম্বল থেকে কান বের করলুম এবং মাফলার খুলে ফেললুম মাথা থেকে। হ্যাঁ—ঠিকই শুনেছি। তাছাড়া দরজার ফাঁকে নক্ষত্র আর দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করে উঠল। বালিশের পাশ থেকে টর্চটা যেই টেনেছি, আবার সেই ফাঁকে নক্ষত্র দেখলুম। এর মানে? কেউ কি এসেছে? কেউ কি কোন দুষ্ট মতলবে তাঁবুতে উঁকি দিচ্ছিল? কে সে? কী তার উদ্দেশ্য? ভাবলুম টর্চ জ্বালার আগে কর্নেলকে চুপি চুপি জাগিয়ে দিই। অমনি নাকে একটা বোঁটকা গন্ধ এসে লাগল। নাড়িভুঁড়ি উগরে পড়ার যোগাড় সেই পচা গন্ধে। নাক ঢেকে চোখ খুলে ভয়ে কাঁপতে থাকলুম। আর কর্নেলকে ডাকারও সাহস হচ্ছে না। যদি ওই নিশুতি রাতের আগন্তুক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

দম বন্ধ করে শুয়ে আছি। সেই সময় কর্নেলের নাক ডাকা বন্ধ হল। একটু সাহস পেলুম। বুড়ো জাগুক, হে ভগবান! বুড়ো ঘুঘুকে জাগিয়ে দাও। এ সব ব্যাপারে ওঁর মাথা খেলে ভাল। এ বয়সে গায়ে জোরও অসাধারণ। যোদ্ধা লোক। যুযুৎসু জানেন কত রকম। শত্রুকে ঢিট করতে জুড়ি নেই ওঁর।

হঠাৎ আবার চমকে উঠলুম। আমার পাশেই তাঁবুর গায়ে খসখস শব্দ! সেই গন্ধটা আরও বিকট এবার। তাপরই কী একটা আমার কপালে এসে পড়ল। ঠাণ্ডা অতি ঠাণ্ডা কিছু শক্ত জিনিস। অমনি আঁতকে উঠে চেঁচালুম—কর্নেল! কর্নেল! আর যন্ত্রের হাতে টর্চের বোতামও টিপে দিলুম। ওদিকে কর্নেলের টর্চও জ্বলে উঠেছে। এক মুহূর্তের জন্য দেখলুম, আমার মাথার উপর দিয়ে একটা—অবিশ্বাস্য! রীতিমতো অবিশ্বাস্য! একটা কংকালের হাত সাঁৎ করে সরে গেল। তাঁবুটা জোরে নড়ে উঠল। পরক্ষণে বাইরে দূরে—অনেক

দূরে কারা মিহি খনখনে গলায় হেসে উঠল—হি হি হি হি······হি হি হি হি···হি হি হি হি!

তারপর কী হল, মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি হ্যাসাগটা কখন জ্বালা হয়েছে। রাতে ওটা নিবিয়ে রাখা হয়েছিল—কারণ আলো থাকলে পাছে দেয়ালের অলৌকিক শক্তির লীলাখেলায় বাধা পড়ে।

কর্নেল ও দীক্ষিত বললেন—জয়ন্ত! জয়ন্তবাবু!

উঠে বসলুম। অমনি সব মনে পড়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বললুম—ওরা কি পালিয়েছে? ওরা কারা এসেছিল কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। বললেন—জানিনা। সত্যি জয়ন্ত, আমি অবাক। হতভম্ব। বিস্তর ঘটনা ঘটতে দেখেছি জীবনে। কিন্তু এর কোন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিনে! একটা জীবন্ত কংকাল! সত্যিকারের কংকাল! বালিতে এইমাত্র তার পায়ের ছাপ আমরা দেখে এলুম। ও ছাপ কোন মানুষ বা প্রাণীর নয়, তা হলফ করে বলতে পারি। আর ওই বিকট হাসিই বা কারা হাসছিল, কে জানে?

দীক্ষিত বললেন—হাসিগুলো যেন গুর্গিন খাঁর দেয়াল থেকে আসছে মনে হচ্ছিল কর্নেল। আমিও সেবার এসে ওই হাসি শুনেছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন – সাড়ে বারোটা প্রায়। আর কী? আলোটা আবার নিভিয়ে দেওয়া যাক্। আধ ঘণ্টা পরে আমরা বেরোব। জয়ন্ত, আর ঘুমিও না।

বেরোতে হবে? কাঁচুমাচু মুখে তাকালুম। তা লক্ষ্য করে কর্নেল চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বললেন,—এই রকম ভয় পেলে তো চলবে না, জয়ন্ত। তুমি না খবরের কাগজের রিপোর্টার!·····

ঠিক একটায় আমরা বেরিয়েছি। প্রচণ্ড শীত। আমার তো সব সময় বুক ঢিব ঢিব করছে। কিন্তু উপায় নেই। কর্নেল আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছেন। নদীর উত্তর পাড়ে অন্ধকারে চুপি চুপি

আমরা তিনজন এবং তিনজন সেপাই একটা পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসেছি। একজন সেপাই রয়ে গেল তাঁবুর পাহারায়। রয়ে গেল মাধোরাম বাবুর্চিও।

বসে আছি তো আছি। আমাদের তিরিশ গজ সামনে গুর্গিন খাঁর দেয়াল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওই কালো দেয়ালটা! মনে হচ্ছে হাজার হাজার অদৃশ্য চোখ দিয়ে সে আমাদের দেখছে আর দেখছে। শয়তানী মতলব ভাঁজছে। যেন উত্তুরে হাওয়ার ভাষায় শনশন করে বলছে—চলে আয়! আয় রে আয়! আয় রে আয়! এই সময় দূরে প্লেনের শব্দ শুনলুম। দেয়ালের আড়ালে পড়ে গেল বলে প্লেনটা দেখতে পেলুম না।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ কর্নেল ফিসফিস করে উঠলেন—ও কী?

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ—যা শুনেছিলুম, তাই। দুটো লাল জ্বল-জ্বলে চোখ যেন দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে আছে। একটু পরে চোখ দুটো দুলতে শুরু করল। ওপরে-নীচে, কখনো দু'পাশে। দুলছে আর মাঝে-মাঝে যেন চলে বেড়াচ্ছে।

অন্ততঃ দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ব্যাপারটা ঘটল। তারপর এক ঝলক আলো আকাশের দিকে ছুটে গেল ধূমকেতুর মতো। কয়েক সেকেণ্ড ওই আলোর ঝাঁটাটা স্থির হয়ে থাকার পর ডাইনে বাঁয়ে দু'বার নড়ে উঠল। তারপর আবার স্থির।

ঠিক এই সময় কানে এল বিকট এক চিৎকার। ও কি মানুষের না দানবের? মাথায় পুরু করে মাফলার কান অব্দি জড়ানো। তবু মনে হল কানে তালা ধরে যাচ্ছে। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! অদ্ভুত সেই আওয়াজ যেন আর্তনাদ, যেন প্রচণ্ড ক্রোধ। আমরা শক্ত হয়ে বসলুম। দীক্ষিত কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখি কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা স্বরে 'চলে এস তোমরা' বলেই হাঁটতে শুরু করলেন।

কী সর্বনাশ! এ যে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করার সামিল। কিন্তু

উপায় নেই। একা এখানে পড়ে থাকার সাহস আমার নেই। এমন কি দৌড়ে নদীর তলায় তাঁবুর কাছেও যেতে পারব না—যদি ফের জ্যান্ত কংকালের পাল্লায় পড়ে যাই!

পিছনে অন্ধের মতো মরীয়া হয়ে চললুম। কয়েক পা যেতেই দেয়ালের অশরীরীরা আওয়াজ আরও বাড়িয়ে দিল। সে বিকট চেঁচামেচির বর্ণনা ভাষায় দেওয়া দুঃসাধ্য। যেন হাজার হাজার প্রাগৈতিহাসিক দত্যি-দানো হঠাৎ নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙ্গে হইচই বাঁধিয়েছে। কখনও মনে হচ্ছে তারা আর্তনাদ করছে, কখনও হি হি হি করে তখনকার মতো বিকট ভূতুড়ে অট্টহাসি হাসছে।

ঢিবির কাছে আমরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল টর্চ জ্বেলে দেয়ালে আলো ফেললেন। অমনি আমার পিলে চমকে উঠল। পাঁচিলের সেই ফাটলে মরা গাছটার ডালে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে সেই জ্যান্ত কংকালটা। এই দৃশ্য দেখামাত্র সেপাইরা হুকুম পাবার আগেই দুমদাম বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি উঠল। সবাই দৌড়ে ঢিবিতে উঠলুম। কর্নেলের টর্চ সমানে কংকালটার ওপর পড়ে রয়েছে। কংকালটা নড়ছে এবার। কর্নেল জ্বলন্ত টর্চ ও রিভলবার হাতে নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেলেন। অমনি সব বিকট আওয়াজ থেমে গেল। অস্বাভাবিক স্তব্ধতা জাগল।

কর্নেলের চিৎকার শুনলুম—মিঃ দীক্ষিত! এখানে আসুন।

আমি পা বাড়িয়েছি সবে, সেপাইরা সবাই একসঙ্গে টর্চ জ্বেলেছে—দেখি পাশের ঝোপ ঠেলে সেই কালান্তক ষাঁড়টা বেরিয়ে আসছে—হ্যাঁ, আমার দিকেই।

অমনি ভূতের ভয়, এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা, সব কিছু মুহূর্তে ভুলে তক্ষুনি দৌড় দিলুম। সন্ধ্যাবেলায় যেভাবে দৌড়েছিলুম, ঠিক সেভাবেই।

ঠাহর করে নদীর ধারে পৌঁছে তখন টর্চ জ্বাললুম। ষাঁড়টাকে পিছনে দেখতে পেলুম না। কিন্তু দূরে দেয়ালের ওখানে আবার মুহুর্মুহুঃ গুলির আওয়াজ শুনতে পেলুম। টর্চের আলোও ঝলকে

উঠল বারবার। তারপর প্লেনের আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম না প্লেনটা।

বোবাধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলুম—মাধোরাম! মাধোরাম!

সাড়া এল—বাবুজী! বাবুজী! আপ কিধার হ্যায়?

সে রাত্তে কর্নেল, দীক্ষিত এবং সেপাই তিনজন ফিরে এলেন যখন, তখন রাত প্রায় তিনটে। হ্যাসাগ জ্বালা হল। সেই আলোয় দেখি, ওঁরা একগাদা তার, প্রকাণ্ড ব্যাটারী সেট, বাল্ব, টেপরেকর্ডার মাইক্রোফোন এনেছেন সঙ্গে। ব্যাপার কী? তারপর আমার পিলে চমকাল আবার। কর্নেল দস্তানাপরা হাতে সেই কংকালটার হাত ধরে আছেন এবং সেটা মাটিতে আধখানা গড়াচ্ছে—অর্থাৎ আসামীকে টানতে টানতেই এনেছেন, যেন আসতে চায়নি—মাটিতে লুটিয়ে আনতে হয়েছে ব্যাটাকে। আমি ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, আশা করি রহস্যটা টের পেয়ে গেছ এখন।

জোরে মাথা দোলালুম।—পাইনি।

—পাও নি? তোমার ভয়টা আসলে এখনও কাটেনি। বলে কর্নেল তাঁবুর সামনেকার নিভন্ত আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলে দিলেন। আগুন জ্বলে উঠল। ক্যাম্পচেয়ার বের করে তার সামনে বসে চুরুট ধরালেন।

দীক্ষিত বললেন—তাহলে গাড়ি নিয়ে অর্জুন চলে যাক, কর্নেল। রেডিওমেসেজ পাঠাবার ব্যবস্থা করুক।

কর্নেল বললেন—অবশ্যই। হেলিকপটারটা পাকড়াও করা যাবে অন্তত:। মালগুলো হয়তো পাচার হয়ে যাবে।

হতভম্ব হয়ে বললুম—মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান, ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি?

কর্নেল হাসলেন।—এখনও খুলে বলতে হবে? এ স্মাগলিংয়ের

কারবার, জয়ন্ত। স্রেফ চোরাচালানী মালের ব্যাপার। গাঁজা আফিং চরস কোকেন এসব মাদকদ্রব্য এই অখদ্যে এলাকায় চোরা-চালানীরা এনে ওই গুর্গিন খাঁর দেয়ালের একটা গুপ্ত জায়গায় মজুত করে। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে দেয়ালের মাথায় লাল বাল্ব জ্বেলে হেলিকপটারকে সংকেত দেয়। কখনও স্রেফ হলদে আলোও দেখায়। এই হেলিকপটার তখন মাঠে নেমে পড়ে। এরা মালগুলো ওতে পৌঁছে দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য শয়তান-গুলোকে তাড়া করতেই ব্যস্ত ছিলুম, হেলিকপটারটা গতিক বুঝে উড়ে পালাল।

বললুম—এই কংকালটা? আর ওই অট্টহাসি?

কর্নেল বললেন—কংকালটা নকল। এতে দুর্গন্ধ এমিনো এসিড মাখানো আছে। চোরাচালানীদের কেউ এটা নিয়ে এসেছিল আমাদের তাঁবুতে। ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আর আওয়াজ হত একটা টেপরেকর্ডারে। মাইক্রোফোন ফিট করা ছিল দেয়ালে। নির্বিঘ্নে চোরাচালানী লেনদেনের ঘাঁটি গড়ার জন্যে ব্যাটাদের এতসব আয়োজন। যাক্ গে! মাধোরাম, কফি বানাও!

বড়লাট ও এক বেয়াদপ বাঘ

তখন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব। আমরা যাঁকে বড়লাট বলতুম, তিনি কিন্তু ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর প্রতিনিধি অর্থাৎ ভাইসরয়। তিনি রাজা বা রানীর নামে ভারত শাসন করতেন। এমনি ভাইসরয় বা বড়লাট একজন ছিলেন লর্ড রিডিং।

তখন এদেশে রাজামহারাজাদের যুগও বটে। অনেক ছোট-ছোট রাজ্য ভারতে ছিল। সেখানে ইংরেজ শুধু বার্ষিক কয়েক লাখ

টাকা কর নিয়েই খুশী থাকত। তাদের ভেতরের ব্যাপারে নাক গলাত না। এই রকম একটা ছোট্ট রাজ্য ছিল গোয়ালিয়র।

রাজামহারাজারা সব সময় ইংরেজ বড়লাটকে বেজায় খাতির করে চলতেন। কিসে তিনি খুশী হবেন, তার খোঁজখবরও নিতেন। নিজের রাজ্যে নেমন্তন্ন করে আনতেন তাঁকে। খুব ধুমধড়াক্কা পড়ে যেত। উৎসব হত। এতে বেশ কয়েক লাখ টাকাও খসে যেত নিশ্চয়। কিন্তু তাতে কী? বড়লাট খুশী হলে রাজত্ব চালানো নির্ঝঞ্ঝাট হয়। ইংরেজের দাপট তখন সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। বাঘ আর গোরুকে একঘাটে জল খাওয়ানোর ক্ষমতা ইংরেজ ছাড়া তখন কারই বা আছে? তাকে চটানোর সাহস কোথায়?

নতুন বড়লাট লর্ড রিডিংকে গোয়ালিয়রের মহারাজা তাই নেমন্তন্ন করলেন। আর বড়লাট বলে কথা। একা তিনি তো আসছেন না, আসছে তাঁর পাত্রমিত্র সভাসদ দেহরক্ষী বাবুর্চি খানসামা মিলিয়ে কয়েকশোজন। রাজ্যে হই হই পড়ে গেল। খানা-পিনা, গান-বাজনা, বাজি পোড়ানো, আদিবাসীদের নাচ, কুস্তিগীরদের কুস্তি, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, তীরন্দাজদের তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতা—কিছুই বাদ পড়ল না। মহারাজার একটা চিড়িয়াখানা ছিল। সেখানে পোষা বাঘ ছিল কয়েকটা। বাঘে মানুষে লড়াই দেখানোও হল।

একটা চারদিক ঘেরা ছোট্ট স্টেডিয়ামে বাঘেমানুষে লড়াই দেখতে দেখতে লর্ড রিডিং হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—মহারাজা ওটা কি সত্যিকার বাঘ?

মহারাজা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন,—কেন—কেন ইওর এক্সেলেন্সি? (বড়লাটদের সম্মান জানাতে ইওর এক্সেলেন্সি বলা হত)।

লর্ড রিডিং আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি বলেছিলেন, এই বাঘগুলো বাচ্চা থেকে বড় করা হয়েছে আপনার চিড়িয়াখানায়। কসরত শেখানো হয়েছে। তাই এরা কখনও সত্যিকার বাঘ হতে পারে না। সত্যিকার বাঘ জঙ্গলে থাকে।

মহারাজ মাথা চুলকে বললেন—ঠিক বলেছেন ইওর এক্সেলেন্সি!

বড়লাট একটু হেসে বললেন—মহারাজা, আমি একটা সত্যিকার বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখতে চাই।

বড়লাটের মোসাহেবরা অমনি এক সুরে বলে উঠল—অবশ্যই, অবশ্যই! মহারাজার পক্ষে এ আর কঠিন কী? এ তো খাসা প্রস্তাব।

মহারাজা মনে মনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। সর্বনাশ, জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সাহস তাঁর কোন্ কুস্তিগীরের হবে? আর সে তো মরাবাঁচার লড়াই। কেবল সিং নামে পালোয়ানটি এতক্ষণ পোষা বাঘের সঙ্গে যা করল, তা শেখানো কসরত মাত্র। বাচ্চা বয়স থেকে বাঘটাকে ওই রকম তালিম দেওয়া হয়েছে। কেবল সিং কি জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি সত্যিকার লড়াই করতে রাজী হবে? খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন মহারাজা। কিন্তু বড়লাটকে বিমুখ করাও তাঁর পক্ষে কঠিন। তাই মুখে খুব উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন—এ আর কঠিন কথা কী ইওর এক্সেলেন্সি? খুব হবে। আজই ব্যবস্থা করে ফেলছি।

কেবল সিংকে চুপিচুপি ব্যাপারটা জানাতেই কিন্তু সে রাজী হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে সে মানুষ। কত বাঘ সে বর্শা বা টাঙির আঘাতে মেরেছে। আবার বন্দুকবাজ শিকারী হিসেবেও তার নাম আছে। একবার পাগলা হাতির কবল থেকে সে অনেক মানুষকে বাঁচিয়েছিল—এমনি অব্যর্থ তার বন্দুকের টিপ। এদিকে কুস্তিগীর পালোয়ান হিসেবেও সারা ভারতে সে নাম কিনেছে। সে বলল—চিন্তার কারণ নেই হুজুর। সে আমি পারব। কিন্তু আগে বড়লাটবাহাদুরকে জিগ্যেস করুন, তিনি দৃশ্যটা দেখতে পারবেন তো? নাকি পয়লা রাউণ্ডেই ভিরমি খাবেন? সত্যিকার বাঘ কিন্তু সত্যিকার হাঁক দেয়। তখন কানের পর্দা ফাটবে না তো।

মহারাজা জিভ কেটে বললেন—চুপ, চুপ। কে শুনতে পাবে?

কেবল সিং হাসতে হাসতে সরে গেল। মহারাজা তখন মন্ত্রণাসভা ডাকতে গেলেন। আয়োজনটা সহজ নয় মোটেও। গোয়ালিয়রে জঙ্গল তখন অনেক, বাঘও ছিল অসংখ্য। কিন্তু বড়লাটের সামনে

লড়াইটা ঘটানো নিয়েই যত সমস্যা। দিনের আলোয় বাঘ বেরোবে না। বেরোলেও লড়াইটা তারিয়ে তারিয়ে বড়লাটকে দেখতে দেবে কিনা, সে তার মর্জি। তাছাড়া বড়লাটকেও অক্ষত শরীরে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আছে।

অনেক পরামর্শ হল। কিন্তু কিছু ঠিক করা গেল না। তখন ডাকা হল রাজ্যের বনবিভাগের বড় অফিসারকে। তাঁর নাম কর্নেল কেশরী সিং। দুর্দান্ত শিকারী তিনি। তলব পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে সব শুনে বললেন—আচ্ছা, দেখা যাক্।

কর্নেল কেশরী সিং কিন্তু কেবল সিংয়ের গুরু। গুরুশিষ্যে পরামর্শ হল। রাজ্যের জঙ্গল এলাকায় এখন ম্যানইটার বা মানুষখেকো বাঘ থাকলে বেশী হাঙ্গামা করতে হত না। কিন্তু শেষ মানুষখেকোটি গত মাসে কর্নেল সিং মেরে ফেলেছেন। এখন কিছু গরুচোর বাঘ নানা এলাকায় আছে। তারা তো নেহাত চোর। তাই যেমন ধূর্ত, তেমনি গা বাঁচিয়ে চলাফেরা করতে ওস্তাদ। দিনে তাদের লেজের ডগাটিও দেখতে পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। জ্যান্ত ছাগল বা মোষের টোপ বেঁধে রাখলেও দিনদুপুরে সে ব্যাটা হামলা করবে না। এলে সেই সন্ধ্যাবেলায়।

হঠাৎ কেবল সিং বলে উঠল—স্যার, এখন তো বাঘের সঙ্গী খোঁজার ঋতু ?

—তাই তো! বলে কর্নেল সিং লাফিয়ে উঠলেন। এমন সহজ রাস্তা থাকতে বাঁকা রাস্তায় ঘুরে মরছিলেন!

কেবল সিং জঙ্গলে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটানোর ফলে নানা জন্তুর ডাক অবিকল নকল করতে পারত। এপ্রিল মাসে পুরুষবাঘ সঙ্গিনীর খোঁজে জঙ্গল তোলপাড় করে। আবার স্ত্রীবাঘও সঙ্গীর খোঁজে ভীষণ ডেকে বেড়ায়। কেবল সিং বাঘের ডাক ডাকলে নিশ্চয় কোন না কোন বাঘ এসে হাজির হবে। তখন সে লড়াই দেবে। আর, এজন্যে তাকে বাঘের ছাল গায়ে ঠিকঠাক পরে অবিকল বাঘ সাজতে হবে। ভেতরে কিন্তু থাকবে পাতলা ইস্পাতের

পোশাক। পায়ে ও হাতের আঙ্গুলে ধারালো ইস্পাতের নখও থাকবে। মুখ ও মাথাতেও ইস্পাতের টুপি ও মুখোশ পরতে হবে। শুধু চোখদুটো বিশেষ ধরনের শক্ত কাচে ঢাকা থাকবে। তাছাড়া এর ওপর বাঘের চামড়া বসানো তো রইলই।

কর্নেল সিং জানতেন, মাইল পনের দূরে খের খো নামে একটা গ্রামে লোকেরা কদিন থেকে একটা বাঘের ডাক শুনতে পাচ্ছে। দিনদুপুরেই ডাকে বাঘটা। তার ফলে ভয়ে চাষীরা মাঠে যেতে পারছে না। রাখালরা গরু-মোষ চরাতে যেতে ভয় পাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারছে না কেউ।

ঠিক হল, সেখানেই বাঘেমানুষে লড়াই দেখবেন মহামান্য বড়লাট বাহাদুর।

খের খো গ্রামটা একটা নদীর ধারে। খো মানে ঘোড়ার খুর। ওখানে নদী ঘোড়ার খুরের মতো বেঁকে গিয়েছে। তাই গ্রামটার চেহারা ওরকম এবং নামও খের খো। চারদিকে পাহাড়ী রুক্ষ পরিবেশ। বড় বড় পাথর, কাঁটা ঝোপ আর ক্ষড়াথর্বটে মেথু গাছের ঘন জঙ্গল। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে যেখানে বাঘটাকে শেষবার ডাকতে শোনা গিয়েছে, সেখানে খাড়া পাথরের দেয়াল নদীতে নেমেছে। ওপরে পাহাড়ের কিছু অংশ ওই সব ঝোপ জঙ্গলে ভরা। পাহাড়ে অনেক গুহা আছে। কর্নেল সিংয়ের মনে হল, বাঘটা কোন গুহাতেই সম্ভবতঃ থাকে।

কিন্তু কাছাকাছি তেমন কোন ফাঁকা সমতল জায়গা পাওয়া গেল না, যেখানে বাঘেমানুষে লড়াই হবে। সবখানেই পাথর, ঝোপঝাড়, উঁচুনীচু জমি। সবচেয়ে বড় কথা, বড়লাট নিরাপদে বসে লড়াই দেখবেন, এমন জায়গা তো চাই। যদি বা কোথাও সমতল কিছু ফাঁকা জায়গা মিলল তো কাছাকাছি কোন উঁচু গাছ নেই যাতে মাচান বাঁধা হবে বড়লাটের জন্য। কেউ কেউ বললেন, বড় বড় শালকাঠ পুঁতে উঁচুতে টাওয়ার তৈরি করা হোক। কিন্তু ওই পাথুরে মাটিতে শাবল দিয়ে গর্ত করতে পুরো মাস কাবার হয়ে যাবে। অত

সময় কোথায় বড়লাটের ?

কর্নেল সিং নদীর ধারে পাহাড়টার ওপর দাঁড়িয়ে ওপারটা লক্ষ্য করছিলেন। ওপারেও পাহাড় রয়েছে। নদীর ধারে অজস্র নল-খাগড়া জাতের জঙ্গল গজিয়েছে। তাছাড়া পাহাড়টা এপারের মতো রসকষহীন নয়, শুকনো ঘাস আর গাছপালাও রয়েছে। হঠাৎ সেখান থেকে একটা বাঘের গর্জন ভেসে এল।

কী কাণ্ড! বাঘটা তাহলে ওপারে রয়েছে। কর্নেল সিং তক্ষুণি ওপাশের উপত্যকায় নেমে এলেন মহারাজের কাছে। মহারাজা দলবল নিয়ে উৎসাহে চলে এসেছেন। বড়লাট তখন হাতির পিঠে একটু দূরে অপেক্ষা করছেন।

বিরক্ত হলেন কর্নেল সিং। এর কোন মানে হয় ? সব ঠিকঠাক করে খবর যাবে, তবে তো ওঁরা আসবেন।

মহারাজা বললেন—হিজ এক্সেলেন্সি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনটা না হলে আর উনি থাকবেন না। তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করে ফেলো কর্নেল সিং।

কর্নেল সিংয়ের মনে পড়ল, যে পাহাড়টায় এখন দাঁড়িয়েছিলেন, তার ওপাশে নদীর দিকে একটা চাতালমতো আছে। তার দুহাত নীচে নদীর জল। ওই চাতালে বসলে বাঁদিকে হাত তিরিশ দূরে একটা বালির চড়া চোখে পড়ে। চড়াটা আন্দাজ পনের হাত চওড়া, কুড়ি হাত লম্বা। তার চারদিকে একসার নলখাগড়া ও শরের জঙ্গল রয়েছে। কিন্তু চাতালটা থেকে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়।

চাতালটা নিরাপদ হবে বড়লাটের পক্ষে। কর্নেল সিং মহারাজাকে তাঁর মতলবটা জানিয়ে দিলেন। বড়লাটকে খবর পাঠানো হল তক্ষুণি।

কেবল সিং বাঘ সেজে তৈরী হয়ে সেই বালির চড়ায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। কর্নেল সিং পাহাড়ের ওপর থেকে ইশারা দিলে কেবল সিং বাঘের ডাক ডাকবে।

বড়লাট লর্ড রিডিং কিন্তু নিরস্ত্র বসতে চান না। বনের বাঘকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই সঙ্গে একটা রাইফেল নিলেন। শুধু মহারাজা ছাড়া আর কাকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন না। মহারাজা বড়লাটের দেখাদেখি একটা রাইফেল নিলেন। তারপর কর্নেল সিং দুজনকে সাহায্য করলেন চাতালে বসতে।

এবার কর্নেল সিং ওপরে গিয়ে ইশারা দিলেন কেবল সিংকে। অমনি কেবল সিং বাঘের ডাক ডেকে উঠল। বার তিনেক ডাকার পর ওপারের পাহাড় থেকে বাঘটার পাল্টা ডাক ভেসে এল। নদীর ওপর দিয়ে এসে ডাকটা পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল দ্বিগুণ জোরে। মনে হল একসঙ্গে কয়েকশো কামান গর্জাল। পাহাড়ের ওপর বড়লাট ও মহারাজার পাত্রমিত্র মোসাহেবরা হামাগুড়ি দিয়ে বসেছিলেন কর্নেল সিংয়ের নির্দেশে। সত্যিকার বাঘের ডাক শুনে তাঁদের অবস্থা হল শোচনীয়। ঠকঠক করে কেউ কাঁপতে শুরু করলেন, কেউ দিশেহারা হয়ে গড়াতে গড়াতে পাথর আঁকড়ে ভিরমি খেলেন। সে এক করুণ অবস্থা। বেচারা কর্নেল সিং যত তাঁদের চাপা ধমকান, তত তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। কেউ ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেললেন—বাঘটা যদি বড়লাট বাহাদুরকে ধরে ফেলে, রাজত্ব চালাবে কে ?

ওদিকে কেবল সিং আর ওপারের বাঘটা পালটাপালটি ডাকাডাকি করছে। গর্জনে-গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে সবার। মহারাজা আর বড়লাট পাথরের বেদীর ওপর একেবারে দুটি পাথরের মূর্তি—তবে দাঁড়ানো নয়, অদ্ভুত ভঙ্গীতে হুমড়ি খেয়ে বসে রয়েছেন। কর্নেল দূরবীন চোখে রেখে ওঁদের দেখলেন। ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন হাসির সময় নয়। ভয় হচ্ছে, বড়লাট বাহাদুর আবার জলে না পড়ে যান। খুব কাছে থেকে বনের বাঘের ডাক শুনে নার্ভ ঠিক রাখার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে।

হঠাৎ দেখা গেল, বাঘটা ওপার থেকে নদীর জলে নামল। খুব আশা জাগল এবার। বাঘেমানুষে লড়াই আসন্ন। ভয়ের সঙ্গে

উত্তেজনায় এখন প্রতিটি চোখ বড় হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এ কী! বাঘটা যে বালির চড়ার দিকে যাচ্ছে না। সোজা চলে আসছে পাথরের চাতালটার দিকে—যেখানে মহারাজা আর বড়লাট বসে রয়েছেন! সর্বনাশ! প্রমাদ গণলেন কর্নেল সিং। ওঁদের নিরাপদে রাখার দায়িত্ব তো তাঁরই।

তিনি তক্ষুণি দৌড়ে নামতে শুরু করলেন চাতালটার দিকে। ততক্ষণে বাঘটা তরতর করে চলে এসেছে। চাতালটার প্রায় হাত পনের দূরে তার প্রকাণ্ড মাথাটা শুধু জলে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কর্নেল সিং রুদ্ধশ্বাসে বললেন—ইওর এক্সেলেন্সি। বাঘ, বাঘ! গুলি করুন!

লর্ড রিডিং বড়লাটী মেজাজে বললেন—এমন তো কথা ছিল না, বাপু! আমি বাঘেমানুষে লড়াই দেখব বলেছিলাম। নিজে লড়াই করব, তা তো বলিনি!

—ইওর এক্সেলেন্সি! বাঘটা এখন খুব হিংস্র অবস্থায় আছে। কারণ সে সঙ্গীর ডাক শুনে আসছে। গুলি করুন, শীগগির!

লর্ড রিডিং খাপ্পা হয়ে বললেন—যেমন তোমরা, তেমনি তোমাদের দেশের বাঘ! এমন তো কথা ছিল না! ইউ গুড কিপ ইওর প্রমিজ! তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি রাখছ না!

তখন বাঘটা মাত্র হাত দশেক দূরে চলে এসেছে। এসময় বাঘের মেজাজ ভীষণ হিংস্র থাকে। ওর চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল সিং মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন—বাঘটা আপনার ওপর হামলা করতে আসছে ইওর এক্সেলেন্সি!

কী! ভারতের বড়লাট বাহাদুরের উপর হামলা করবে ওই তুচ্ছ একটা নেটিভ বাঘ? লর্ড রিডিং এবার সেই ঔদ্ধত্য টের পেয়েই রাইফেল তুলে বাঘটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলেন—পরপর দুবার। কিন্তু বাঘটার কিছুই হল না গুলি লাগল না।

কর্নেল সিং চেঁচিয়ে উঠলেন—মহারাজা, মহারাজা!

মহারাজা এতক্ষণ বেকুব বনে গিয়েছিলেন। এবার রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপলেন। ক্লিক করে একটু আওয়াজ হল। গুলি বেরলো না। ব্যাপার কী? দেখা গেল, গুলি আদতে ভরাই হয়নি।

তখন তিনি কোটের পকেটে হাত পুরে একটা কার্টিজ বের করলেন। সেটা রাইফেলে ঠেসে ফের ট্রিগার টিপলেন। হা হতোস্মি! রাইফেল জ্যাম হয়ে গেল যে? হন্তদন্ত হয়ে খুলে দেখেন, কোথায় কার্টিজ? আসলে পকেট থেকে যেটা বের করে রাইফেলে পুরেছেন, তা একটা হুইস্‌ল্।

ওদিকে বড়লাটের কাছে আর বাড়তি গুলি নেই। কারণ, তিনি তো গুলি করার জন্য তৈরী হয়ে আসেননি—এসেছেন বাঘেমানুষে লড়াই দেখতে। মহারাজাও তাই। এদিকে কেশরী সিংও তাঁর রাইফেল আনেন নি সঙ্গে। চাতালে নামবার সময় একবার ভেবেছিলেন ওটা নিয়ে আসবেন। কিন্তু বড়লাটবাহাদুরের কাছে তাঁর বিনি হুকুমে রাইফেল হাতে যাওয়া বেয়াদপির সামিল। এখন উপায়?

তখন বাঘটা মাত্র হাত পাঁচেক দূরে জলের মধ্যে ডাঙা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর গা নাড়া দিয়ে জল ঝাড়ছে। তারপর সে সামনে তিনটি কাকতাড়ুয়া মূর্তি দেখে একবার ঘাড় কাত করে সাংঘাতিক একখানা হালুম ঝাড়ল। যেন বলল—কে রে বেয়াদপ? পথ আগলে বসে আছিস, তোদের সাহস দেখছি কম নয়।

মহারাজার হাতে একটি ছড়িও ছিল। রাইফেলের বদলে ছড়ি তুলে তিনি রাজকীয় হুংকারে বলে উঠলেন—যা, যা! ভাগ! ভাগ! তফাত যা!

বাঘটা চুপচাপ জলে দাঁড়িয়ে বড়লাটকে দেখছিল। এতক্ষণে যেন হাসির ভঙ্গীতে হাঁ করল। তার ধারাল দাঁতগুলো দেখে ভয় পেয়ে বড়লাট চেঁচিয়ে উঠলেন—গেট আউট, গেট আউট!

পাহাড়ের চূড়ায় ওঁদের ঠিক মাথার ওপরেই দেহরক্ষী আর পাত্রমিত্ররা এতক্ষণে যেন টের পেল, কী ঘটছে। তারাও একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু করল—গেট আউট, গেট আউট!

একসঙ্গে ওপরে ও নীচে এই বিকট চ্যাঁচানি শুনে বাঘটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর ভারী বেজার হয়ে শেষ ডাক ছেড়ে ঘুরল। ফের জলে নামল। তারপর ধীরে সুস্থে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই সাঁতার কেটে চলল। একটু পরে তাকে ওপারে উঠতে দেখা গেল। এক লাফে সে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হল।

এবার পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নদীর জলে গুলি ছুড়তে শুরু করেছে বড়লাটের দেহরক্ষীরা। সব গুলি শেষ করে তারা চেঁচাতে চেঁচাতে বড়লাট বাহাদুরের কাছে দৌড়ে আসতে থাকল। লর্ড রিডিং তখনও সমানে চেঁচাচ্ছেন—গেট আউট, গেট আউট!

কর্নেল সিং হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে না পেরে আস্তে আস্তে চলে গেলেন সেই বালির চড়াটার দিকে। আশ্চর্য তো, কেবল সিং এতক্ষণ চুপ করে আছে তো আছেই। তার ঘন ঘন বাঘ-ডাক ডাকা উচিত ছিল। তাহলে বাঘটা ফিরে ওর দিকেই চলে যেত। কাজেই এত কাণ্ডের জন্যে কেবল সিংই দায়ী। কেন সে তখন হঠাৎ চুপ করে গেল?

কর্নেল গিয়ে দেখেন, কেবল সিং বাঘের বেশে বালিতে উপুড় হয়ে পেটে হাত চেপে পড়ে আছে। কী ব্যাপার? উদ্বিগ্নমুখে দৌড়ে গেলেন কর্নেল।—কেবল সিং, কেবল সিং! কী হয়েছে?

না—তেমন কিছু হয়নি। কেবল সিং তখন থেকে কেবল হাসি সামলেছে, তাই পেট ব্যথা করছে। পেট ব্যথা নিয়ে কি কেউ বাঘের ডাক ডাকতে পারে? কর্নেল ধমক দিয়ে বললেন—কিন্তু ওদিকে বড়লাট ক্ষেপে গেছেন যে!

কেবল সিং করুণ মুখে বলল—এক কাজ করলে বরং ওঁর ইচ্ছেটা মিটত স্যার?

—কী কেবল সিং?

—আমার মতো আরেকজন মানুষ অবিকল বাঘ সাজলে আমি তার সঙ্গে লড়াই করতুম। বড়লাট মজাসে দেখতেন। কোন

ঝামেলাও হত না!

তাও তো বটে! কর্নেল সিং বললেন—চমৎকার প্রস্তাব! কিন্তু আগে এটা মাথায় খেললে ভাল হত। রোস, সে ব্যবস্থা করেই মহারাজার মুখরক্ষা করা যাক। বড়লাট বাহাদুরের সাধ মিটুক। কাকেও জানতে না দিলেই হল যে বাঘটা সত্যিকার বাঘ নয়।

একেই বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। দুজনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন বড়লাট ও মহারাজার কাছে।

কিন্তু বড়লাট তখন একেবারে রেগে কাঁই। তিনি কিনা ব্রিটিশ সিংহের প্রতিনিধি, আর নগণ্য এক ভারতীয় বাঘ তাঁর সামনে বেয়াদপি করে নিস্তার পাবে? ফেলো তাঁবু, আনো কার্তুজ! ওই বেয়াদপটাকে ঢিট না করে লর্ড রিডিং আর রাজধানী দিল্লীতে ফিরবেন না।

সাজো সাজো রব পড়ে গেল। দেখতে দেখতে সেই অসমতল উপত্যকাতে তাঁবু পড়ল অগুনতি। মহারাজা লোক পাঠিয়ে কয়েক বাক্স বুলেট আনিয়ে দিলেন। সব সেরা রাইফেলটি হাতে নিয়ে লর্ড রিডিং বাঘটাকে কোতল করতে তৈরী হলেন।

কর্নেল সিং আর কেবল সিং ছাড়া আর কে বড়লাটের বাঘ শিকারে সাহায্য করবে? সন্ধ্যার আগে দুজনে নদীর ওপারে গিয়ে একটা জুতসই জায়গা খুঁজে বের করলেন। একটা মস্তো বট গাছ ছিল পাহাড়ের খাঁজে। তার ডালে মজবুত মাচান বাঁধা হল।

বট গাছের বিশ-তিরিশ হাত তফাতে পাহাড়ের গায়ে কিছু ঢালু কিছু সমতল খানিকটা ঘাসে ঢাকা জমি ছিল। জমিটা একেবারে ফাঁকা। সেখানে শক্ত করে গোঁজ পুঁতে একটা হৃষ্টপুষ্ট মোষের বাচ্চা বাঁধা হল।

বট গাছটার ডাইনে কিছু দূরে একটা বড় মেথু গাছ ছিল। তার ডালে বাঁধা হল আরেকটা মাচান।

এবার বড়লাট আর মহারাজাকে নিয়ে কর্নেল কেশরী সিং আর পালোয়ান কেবল সিং ওপারে চললেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে!

হালকা গোলাপী রোদের শেষ ছটাটুকু নদীর জল থেকে মুছে যাচ্ছে। নৌকোটা ওঁদের চারজনকে ওপারে পৌঁছে দিয়েই চলে এল।

বট গাছের মাচানে বসেছেন লর্ড রিডিং আর কর্নেল সিং, মেখু গাছের মাচানে বসেছেন মহারাজা আর কেবল সিং। কথা আছে—বড়লাট বাদে আর কেউ গুলি করবেন না। তবে বড়লাট যদি হুকুম দেন, সে আলাদা কথা।

সন্ধ্যার আবছায়া নামছিল নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে। পাখির ডাকও থেমে গেল কখন। মোষের বাচ্চাটাকে চুপচাপ ঘাস খেতে দেখা যাচ্ছিল। ক্রমশঃ তাকেও আবছা দেখাল। এবার কেবল সিং বাঘের ডাক ডাকবে।

কর্নেল শিস দিতেই সে কথামতো বাঘের ডাক ডেকে উঠল। মোষের বাচ্চাটা অমনি মুখ তুলে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর খুব কাছে থেকেই সেই বেয়াদপ বাঘটা সাড়া দিল। তার প্রচণ্ড গর্জনে পাহাড় কেঁপে উঠল। মোষের বাচ্চাটা লাফালাফি শুরু করেছে তখন। অন্ধকার ঘন হচ্ছে দ্রুত। কিন্তু সামনে ওদিকের পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। দুমিনিটের মধ্যেই ফিকে জ্যোৎস্না এসে অন্ধকারটুকু মুছে ফেলল। হ্যাঁ, দিব্যি দেখা যাচ্ছে, বেয়াদপ বাঘটা ধীরে সুস্থে ফাঁকা জায়গাটায় আসছে। এসে সে মোষের বাচ্চাটার সামনে দাঁড়াল। বেচারা মোষের বাচ্চা তখন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফোঁস ফোঁস করতেও ভুলে গিয়েছে।

কর্নেল সিং অবাক্ হয়ে দেখলেন, লর্ড রিডিং রাইফেল তুলছেন না। তাই ফিসফিস করে বললেন—গুলি করুন ইওর এক্সেলেন্সি।

বড়লাট ফিসফিস করে বললেন—আমার শিক্ষা অন্য রকম হে! মড়িতে না বসলে বাঘকে গুলি করতে নেই। বড় শিকারীদের কাছে শুনেছি।

বাঘটা কিন্তু মোষের বাচ্চাটার সামনে তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এ খুব অদ্ভুত ব্যাপার।

কর্নেল সিং দেখলেন, সুযোগ চলে যাচ্ছে। তাই ফিসফিস করে

বললেন—ইওর এক্সেলেন্সি, এরপর আর সুযোগ পাবেন না।

বড়লাট রেগেমেগে বললেন – থামো তো বাপু! মড়িতে বসুক।

বাঘটা এবার গাছের ডালে মানুষের ফিসফিসানি টের পেল। এদিকে মুখ তুলে একখানা সরেস হালুম ঝাড়ল।

অমনি বড়লাট নার্ভাস হয়ে তাড়াহুড়ো করে পর পর দুবার ট্রিগার টিপে দিলেন। একটা গুলি গিয়ে মোষের বাচ্চাটার গায়ে লাগল। সেটা ঘাড় দুমড়ে পড়ে গেল। আর বাঘটা একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

আর পস্তে লাভ নেই। বড়লাট ক্ষুব্ধভাবে বললেন,—এ রাইফেলের নলের মাছিটা ভুল জায়গায় রয়েছে। তা না হলে বেয়াদপটা কি বেঁচে যায়?

কর্নেল সিং বললেন—ঠিক বলেছেন ইওর এক্সেলেন্সি!

—চলো, নামা যাক। আজ রাতে ব্যাটা আর আসবে না।

অগত্যা তাই। সিঁড়ি নামানো হল। বড়লাট নামছেন, কর্নেল মইটা ধরে রয়েছেন – পাছে টাল না খায়। হঠাৎ দেখা গেল, বাঘটা আবার একলাফে মরা মোষের কাছে এসে হাজির হল। বড়লাটকে কিছু বলার আগেই তিনি তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মহারাজকে ডাকছেন।—মহারাজা, মহারাজা! নেমে আসুন!

বাঘটা গ্রাহ্যও করল না। অমন তাজা ভোজ তাকে উপহার দিয়েছেন বড়লাট বাহাদুর। সে হাপুস হুপুস করে খেতে ব্যস্ত।

চাঁদের আলোয় মাত্র হাত পঁচিশ তিরিশ তফাতে দাঁড়িয়ে লর্ড রিডিং হাঁ করে বাঘটার বেয়াদপি দেখতে লাগলেন।

এদিকে তাঁর রাইফেল তখন কর্নেল সিংয়ের হাতে, কিন্তু কার্তুজ বড়লাটের পকেটে।

ওখানে অন্য মাচান থেকে মহারাজা আর কেবল সিং হতভম্ব হয়ে সব দেখছেন। বড়লাটের গুলি করার হুকুম না পেলে তো গুলি করা যাবে না।

কিন্তু বড়লাট কী বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন, ভাবতেই গা

শিউরে উঠল কর্নেলের। সিঁড়ি বেয়ে তিনি নেমে এসে রাইফেল তুলে দিলেন। ইশারায় কার্তুজ ভরে গুলি করতে বললেন।

লর্ড রিডিং রাইফেলটা নিলেন মাত্র। কোন ব্যস্ততা দেখালেন না। ওদিকে বাঘটা এত কাছে মানুষের উপস্থিতি বরদাস্ত করতে পারছিল না। মাঝে মাঝে খেতে খেতে ঘাড় ঘুরিয়ে গজরাতে লাগল। তারপর মোষটার ঘাড়ে কামড়ে টানতে টানতে ঝোপে ঢুকল। বোধহয় চক্ষুলজ্জার ব্যাপার। মানুষজনের সামনে কি হ্যাংলার মতো খাওয়া যায়? হাজার হলেও সে তো জঙ্গলের রাজা।

কর্নেল সিং এবার মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন—বাঘটা যে মড়ি নিয়ে পালাল ইওর এক্সেলেন্সি!

লর্ড রিডিং গম্ভীর—বেজায় গম্ভীর হয়ে বললেন—আরে, তোমাদের সবই দেখছি পোষা ট্রেণ্ড্ বাঘ!

পরে লর্ড রিডিং বিলেতে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—এ দেশের করদ রাজ্যের রাজামহারাজাদের মতো ধূর্ত আর নেই। তাঁরা মহামান্য ভাইসরয়দের আমন্ত্রণ জানান শিকারে। ভাইসরয় মহোদয়রা বাঘ মেরে নিজেদের বীরত্বে গর্বিত হন। কিন্তু জানেন না যে ওসব বাঘ আসলে রীতিমতো ট্রেণ্ড্ অর্থাৎ শিক্ষিত বাঘ। সার্কাসে যেমন থাকে। এতদিন ভারতে থেকে একটি সত্যিকার বাঘের লেজও আমি দেখলুম না। তাই বন্ধু, তোমাকে আগেভাগে সতর্ক করে দিচ্ছি। যে ভারতীয় মহারাজা তোমাকে শিকারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁকে বোলো—ওসব নকল বাঘ শিকারে তোমার আনন্দ নেই। তখন ওঁর মুখের অবস্থা দেখলে তোমার হাসি পাবে। দেখবে, সব ধূর্তামি ফাঁস হয়ে গেলে মানুষের মুখটা কেমন হাস্যকর খড়িতে আঁকা মুখের মতো দেখায়!

কথাটা উঠেছিল খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে। সাঁতরাগাছিতে রেল লাইনের ধারে একটা পুকুর আছে। খুব মাছ আছে সেখানে। পুকুরের মালিক সরকারী রেল-দপ্তর। ছিপ ফেলে মাছ ধরার এমন সুযোগ নাকি আর কোথাও মিলবে না। অতএব রেলের অফিসে দশটা টাকা জমা দিয়ে সেই পুকুরে ছিপ হাতে বসে পড়া যায়।

ভাদ্র মাসের শেষ। ক'দিন বৃষ্টির পর আকাশ অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। শরতের কড়া রোদে ঘর-বাড়ি গাছ-পালা দারুণ ঝলমল করছে। পূজোর ছুটি আসতে তখনও দেরি। কিন্তু এমন হাসিখুশী দিন দেখে মনটা আগাম ছুটি নিতে চাইছে।

সেই সময় সুবিখ্যাত নান্টুমামা এসে হাজির হলেন।

মামার মাথায় টাক, মুখে ইয়াবড় গোঁফ, আর পেটে ভুঁড়ি আছে। পাছে ভুঁড়ি ওঁকে ছেড়ে পালায়, তাই চওড়া শক্ত বেল্ট টাইট করে পরে থাকেন। এসেই বললেন—কী রে? তোরা সব খবরের কাগজ ঘিরে বসে আছিস কেন! ভোটে দাঁড়াবি নাকি? বিবৃতি দিয়েছিস? দেখি দেখি কী বলেছিস! রেশনে চালের কোটা বাড়াবার কথা বলেছিস তো?

উনি পকেট থেকে চশমা বের করে ঝুঁকে পড়লেন। তখন আমি বললুম—না মামা, মাছ।

—মাছ? আর কিছু নয়, স্রেফ মাছ? বলে মামা আমার দিকে অবাক্ হয়ে তাকালেন। আবার বললেন—চাল নয়, শুধু মাছ? সে কী রে! মাছ খাবি কী দিয়ে? যাঃ!

—হ্যাঁ মামা, মাছ! খবরের কাগজে মাছ বেরিয়েছে!

—খবরের কাগজে মাছ? চালাকি হচ্ছে? মাছ তো পুকুরে থাকে!

ভূতো বলল—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে মামা। এই দেখুন না!

নান্টুমামা খুব গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—হুঁঃ! সাঁতরাগাছির রেল-পুকুর—তার আবার মাছ! যেতিস যদি ডাইনীতলার পেত্নীদীঘিতে, দেখতিস মাছ কাকে বলে! ছিপ ফেলতে না ফেলতেই আড়াই সের থেকে সাত সের ওজনের বাঘা বাঘা রুই উঠে এসে সিগ্রেট খেতে চাইবে!

ইতি বলল—মাছ সিগ্রেট খায় নাকি মামা?

নান্টুমামা বিজ্ঞের মত হেসে বললেন—খায়! তোরা দেখিসনি।

সন্তু বলল—ডাইনীতলার পেত্নীদীঘি না কী বললেন, সেখানে বুঝি পেত্নী থাকে?

—হুঁ! থাকে বই কি!

—আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি মানে? দেখেছি, কথা বলেছি। নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি।

নান্টুমামা এলে আমাদের জোর জমে যায়। এবারও জমে

গেল। উনি ডাইনীতলার পেত্নীদীঘির পেত্নী দেখার গল্প শোনাতে বসলেন। আমরা হাঁ করে শুনে গেলুম। গল্প শেষ হলে সন্তু বলল—ঠিক আছে। মামা, আমাদের তাহলে পেত্নীদীঘিতেই নিয়ে চলুন। মাছ ধরব, পেত্নী দেখব, আবার তার বাড়ি নেমন্তন্ন খাব। কী রে, তোদের কী মত?

আমরা সবাই এক কথায় বলে উঠলুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিয়ে চলুন।

নান্টুমামাকে চিন্তিত দেখাল। বললেন—নিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলুম, শ্রীমতী পেত্নী দেবী বোম্বে গেছেন। সিনেমার স্যুটিংয়েই গেছেন। অবশ্য বলা যায় না, থেকেও যেতে পারেন সেখানে। তার চেয়ে আমরা এই সাঁতরাগাছির রেল-পুকুরেই যাই বরং। সেখানে কি দু' একজন পেত্নী থাকবে না? আলবাৎ আছে। বিজ্ঞাপনে তো সব লেখেনি!

অগত্যা তাই ঠিক হল। দলে বেছে বেছে শুধু সাহসী ছেলে-মেয়েদের নেওয়া হল। কারণ পেত্নীর মুখোমুখি হওয়া সোজা নয়। আমি, সন্তু, ভূতো, গাগলু—এই চারজন ছেলে। আর মেয়ে শুধু একজনই—ইতি।

মামাকে নিয়ে আমরা হলুম ছ'জন। ছ'জনে ছিপ নেওয়া হল দু'খানা। একটা ছিপে মামা আমি আর ভূতো বসবে, অন্যটায় সন্তু, ইতি, গাগলু। ব্যাগ ভর্তি খাবার, ফ্ল্যাস্ক ভর্তি চা নেওয়া হল। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মামা একগাদা ফলও কিনলেন। ছিপ, বঁড়শী, চার, টোপ আগের দিন নিউমার্কেটে গিয়ে কেনা হয়েছিল। রেল-আফিসে টাকাও জমা দিয়ে এসেছিল সন্তু।

রোববার সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ন'টা নাগাদ পৌঁছলুম সাঁতরাগাছি রেল-পুকুরে। রেল-লাইনের ধারেই লম্বা চওড়া মস্ত পুকুর। বাকী তিন দিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার ঘন জঙ্গল। দেখলুম আরও অনেকে ছিপ নিয়ে এসেছে। তারা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়েছে। জঙ্গলের দিকগুলোয় লোক খুব কম। যত লোক, রেল-লাইনের দিকটায়।

নাণ্টুমামা আমাদের দক্ষিণের জঙ্গলে ঢোকালেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা ছিপ ফেলার মত জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে মামার দল বসল। তার হাত বিশেক দূরে ডাইনে একটা জায়গায় বসল সন্তুর দল। আমরা কেউ কোন দলকেই দেখতে পাচ্ছিলুম না। ঝোপের আড়াল রয়েছে। তাতে কী? মাছ গাঁথা হলে চেঁচিয়ে জানিয়ে দেব পরস্পরকে। তা ছাড়া নাণ্টুমামা পকেটে হুইসিল নিয়েছেন। দরকার হলে ওটা বাজিয়ে দেবেন। আয়োজন খুব পাকা করা হয়েছে।

মামা ছিপের ফাতনার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। আমার ও গাগলুর কিন্তু চোখ ব্যথা করছে। ঠায় দুপুর অবধি বসেও মাছের কোন পাত্তা নেই। একটা বাজলে মামা কথা মতো খাবার ডাক দিলেন হুইসিল বাজিয়ে। ছিপ ফেলে রেখে সন্তুরা এসে গেল তক্ষুণি। আমাদের ছিপের একটু তফাতে ঝোপের মধ্যে শতরঞ্চি পেতে আমরা খেতে বসলুম। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা খেতে খেতে চাপাগলায় আমরা কথা বলছি, হঠাৎ ডানদিকে কোথাও জলের মধ্যে জোর শব্দ হল। অমনি সন্তু লাফিয়ে উঠল—ওই রে। আমার ছিপে মাছ গেঁথেছে।

নাণ্টুমামা বললেন—ছিপ আটকে না রাখলে নিয়ে পালাবে রে! দেখে আয় শীগগির।

সন্তু দৌড়ে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে চলে গেল। আমরা খুব আশান্বিত হলুম। নির্ঘাৎ বড়সড় একটা মাছ গেঁথে গেছে ওর বঁড়শীতে।

কিন্তু সন্তু গেল তো গেলই, কোন সাড়া নেই। আমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। তখন মামা দু'বার হুইসিল বাজালেন। তবু সন্তুর সাড়া এল না। এবার মামা গলা চড়িয়ে ডাকলেন—সন্তু! সন্তু!

সন্তুর জবাব নেই।

আমরা মুখ-তাকাতাকি করছি। ইতি উঠে দাঁড়াল। আমি দেখে আসি, বলে সে চলে গেল।

কিন্তু সেও গেল তো গেলই। ব্যাপারটা কী?

নাণ্টুমামার মুখ গম্ভীর দেখাল এতক্ষণে। বললেন—ভূতো! তুই যা তো বাবা। দেখে আয় তো, কী হল!

ভূতো ভয়ে ভয়ে বলল—আ-আ-মি যাব?

নাণ্টুমামা খেঁকিয়ে উঠলেন—হ্যাঁ। তুমি। তুমি না তো কি এই হুইসিলটাকে পাঠাব?

ভূতো আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। আশ্চর্য, দশ মিনিট অপেক্ষা করেও সে ফিরল না। তখন মামা গম্ভীর মুখে বললেন—এবার গাগলু যা!

গাগলু নাদুস নুদুস ছেলে। তার হাঁটতে কষ্ট হয় মোটকা শরীর নিয়ে। সে ঝোপ ঠেলে অনেক কষ্টে এগোল। নাণ্টুমামাকে বেজায় ভয় করে। না গিয়ে উপায় কী?

কিন্তু সেও যে গেল তো গেলই।

গাগলুও যখন ফিরল না, তখন নাণ্টুমামা রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তোদের মতো অকম্মা দেখা যায় না! আমি নিজেই যাচ্ছি। এই রাজু, তুই ছিপের কাছে যা! ফাতনা নাড়লেই জোর খ্যাঁচ দিবি। সাবধান! এই হুইসিলটা রাখ বরং। বেগতিক দেখলে তিনবার বাজাবি মনে থাকে যেন—তিনবার।

নাণ্টুমামা চলে গেল আমি ছিপের কাছে এলুম। তারপর উঁকি মেরে সন্তুর ঘাটটা দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু একটা ঝোপ জলে ঝুঁকে থাকায় কিচ্ছু দেখা গেল না। পুকুরটাও দামে ভর্তি। ওর ছিপ দেখাও সম্ভব নয়।

বসে আছি তো আছিই। ফাতনা কাঁপে না যেমন, তেমনি সন্তুদের ওখান থেকেও কোন সাড়া নেই। এর মধ্যে পুকুরের ওপারে দূরে রেল-লাইনে কতবার রেলগাড়ি গেল। একা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমারও খুব রাগ হল। আশ্চর্য তো! কী এমন কাণ্ড হচ্ছে ওখানে, যে যাচ্ছে সে আর ফিরছে না?

শেষমেষ আমি উঠে দাঁড়ালুম। মামার বারণ না মেনে সন্তুদের ঘাটের দিকে এগোলুম।

ঝোপ-ঝাড় যত, গাছও তত। কাঁটায় জামাপ্যান্ট আটকে যাচ্ছিল। হাত দশেক এগিয়েছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলুম সামনেই একটা ঘন ডালপালাওয়ালা গাছে নান্টুমামা বসে রয়েছেন! ব্যাপার কী? মামার মুখটা ওপাশে ঘোরানো। কী যেন দেখছেন। শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপছে।

ডাকতে যাচ্ছি, নান্টুমামা হঠাৎ ঘুরে আমাকে দেখেই ঠোঁটে আঙুল রাখলেন। তক্ষুণি বুঝলুম, চুপ করতে বলছেন। তারপরই উনি আঙুল দিয়ে গাছে চড়তে ইশারা করলেন। ভুরু কুঁচকে ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন মামা। চোখে ভর্ৎসনার ভঙ্গী। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। ওদিকে মামা সমানে ইশারা দিচ্ছেন গাছে চড়তে।

এবার বাঁদিকে আরেকটা গাছে চোখ গেল। চমকে উঠলুম! দেখলুম, ভূতো ডগায় একটা ডালে বাঁদরের মতো বসে আছে। গোড়ার কাছে একটা মোটা ডালে গাগলুও রয়েছে। ডাইনে তাকালুম। সেদিকেও একটা গাছে দেখলুম সন্তু আর ইতি চুপচাপ বসে আছে।

কী করব, ভাবছি। এমন সময় দেখি মামার গাছের তলায় ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল একটা মস্তো ভালুক।

ব্যস। অমনি সব টের পেয়ে গেলুম। দিশেহারা হয়ে কাছেই একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম। তারপর যে কসরত করে ডালে উঠলুম, তা সার্কাস ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না।

ডালে উঠে নিরাপদে বসে নীচে সেই ভালুকটাকে খুঁজলুম। ব্যাটা মামার ডালের নীচেই দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে চারপায়ে। মামার নাকের উপরে চশমাটা ঝুলছে। ভয় হল, এক্ষুণি বুঝি ভালুকের নাকেই গিয়ে পড়বে। না জানি কী ধুন্ধুমার কাণ্ড হবে তাহলে!

ভালুকটা নড়ছে না। কিন্তু ভালুক তো গাছে চড়তে পারে!

যেই কথাটা মনে হওয়া, পিলে চমকে গেল। সর্বনাশ হয়েছে! গাছে ওঠা তো ঠিক হয়নি! কিন্তু এখন নামাও যে বিপদ। মুখোমুখি

পড়ে যাব যে!

কতক্ষণ ওইভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছি ঠিক নেই। হঠাৎ জঙ্গলে বাতাস উঠল। তারপর টের পেলাম. আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। ভালুকটা চুপচাপ শুয়ে পড়েছে নান্টুমামার গাছটার নীচে। দেখতে দেখতে আলোর রঙ ধূসর হয়ে গেল। তারপর শুরু হল বৃষ্টি। সে বৃষ্টির কোন তুলনা নেই। মনে হল আকাশের মেঘগুলো ভেঙে পড়ছে একেবারে। ভিজে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলুম। গাছের তলায় আর জঙ্গলের সবখানে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। অসহায় হয়ে বসে বসে ভিজছি আর ভিজছি। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বাজ ডাকছে। বুকে খিল ধরে যাচ্ছে। মনে মনে নাক কান মলছি—আর কখনো মাছ ধরার নাম করব না।

বৃষ্টি একটু কমেছে সবে। কিন্তু সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়েছে। এমন সময় নান্টুমামার চাপা ডাক শুনতে পেলুম—সন্তু! ইতি! গাগলু! ভূতো! রাজু! সবাই নেমে আয়। ভালুকটা পালিয়েছে।

একে একে নেমে গেলুম চারদিকের গাছ থেকে বৃষ্টিভেজা ছ'টি অদ্ভুত মূর্তি। সবাই ঠকঠক করে কাঁপছি। মামা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন—সব পড়ে থাক। চল, আগে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিই। জঙ্গলের বাইরে নিশ্চয় ঘরবাড়ি আছে। আয়, চলে আয়।

আমরা এগোলুম। স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। বিদ্যুতের আলোয় দেখে দেখে পা ফেলতে হচ্ছে। কতদূর যাবার পর নান্টু-মামা বলে উঠলেন—সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না?

একবার বিজলী ঝলসে উঠতেই দেখলুম, তাই বটে। গাছপালার মধ্যে একটা মস্তো দালানবাড়ি রয়েছে। দৌড়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছলুম আমরা। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়িটায় কোনো আলো নেই। কোনো লোকজন নেই।

নির্ঘাৎ পোড়ো বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে গেলুম। বারান্দায় উঠে দেখি, সত্যি তাই। দরজা জানলা বলতে কিছু নেই। ভেতরে

কোন আসবাবপত্রও নেই। টর্চ পুকুরের ধারে পড়ে আছে। এবার তাই নান্টুমামা দেশলাই জ্বাললেন। সেটুকু আলোয় যা দেখলুম, আমার পিলে আবার চমকাল।

ঘরের কোণায় শুয়ে আছে—আবার কে? সেই যমের মতো ভালুকটা!

আর কী? এবার আর রক্ষে নেই। গাগলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ভূতো বলল—মা-মা-মা-মা! ভা-ভা-ভা-ভালু…

ওদিকে মামা তখন মরিয়া। বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন—গেট আউট! গেট আউট ইউ স্কাউণ্ড্রেল! ডু ইউ নো, হু অ্যাম আই? ইউ ব্ল্যাক বিয়ার! আই অ্যাম নান্টুবাবু!

সেই সময় কার কথা শোনা গেল অন্ধকারেই, সেই ঘরের কোণ থেকে!—বাবুসাব মাৎ ঘাবড়াইয়ে। লছমী কুছ নেহি বোলে গা! বহুৎ আচ্ছা ভালু বাবুসাব!

নান্টুমামা হুঙ্কার দিয়ে বললেন—কোন ব্যাটা রে?

—হামি ভালুওয়ালা আছি বাবুসাব। আজ সকাল থেকে লছমী—হামার এই ভালু হারিয়ে গিসলো। বিষ্টির সমোয়ে লছমীকে জঙ্গলে দেখতে পেছল বাবুসাব। তো এখানেই লিয়ে আসল।

নান্টুমামা হো হো করে হেসে বললেন—ব্যাটা ভূত কাঁহেকা!

আমরা এতক্ষণে হেসে উঠলুম। হেসেই বেঁচে উঠলুম বলা যায়। কিন্তু সাঁতরাগাছির রেল-পুকুরে তাই বলে আর কখনও মাছ ধরতে যাচ্ছি না। বাপ্‌স্!

টুপির কারচুপি

নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গেলুম। কর্নেল ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো। মাথায় টাক ও মুখে দাড়ি আছে। একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। খ্রীস্টান। ভারি অমায়িক আর হাসি-খুশি মানুষ। একা থাকেন।

কিন্তু বুড়ো হলে কি হবে!

এখনও ওঁর গায়ে পালোয়ানের মতো জোর আছে। দৌড়ে পাহাড়ে চড়তে পারেন। বাঁ হাতে রাইফেল ছুড়ে বাঘ মারতে পারেন। পারেন না কি, তাই-ই বলা কঠিন। সারাজীবন নানা

দেশে বিদঘুটে এ্যাডভেঞ্চারে গেছেন—জঙ্গলে, সমুদ্রে, দ্বীপে, বরফের দেশে।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা আর বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। অবসর নেবার পর ওঁর হবি হচ্ছে দুর্লভ জাতের পাখি, পোকামাকড় ও প্রজাপতি খুঁজে বেড়ানো। এজন্যে প্রায়ই উনি পাহাড়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী বলতে আমি—এই জয়ন্ত চৌধুরী। আমার মতো একজন যুবকের সঙ্গে ওই বুড়োর গলাগলি ভাব যে কতটা, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারও।

এই কর্নেলবুড়োর আরেক বাতিক গোয়েন্দাগিরি। অনেক বড় বড় ডাকাতি আর খুনের হিল্লে করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। শুধু পুলিশ মহলের নয়, সবখানেই ওঁর নামটা বিলক্ষণ চেনা। কেউ যদি বলে 'বুড়ো ঘুঘু' তাহলে বুঝতে হবে সে নির্ঘাৎ কর্নেলের কথাই বলছে।

সেই রোববারের সকালে ওঁর বাসায় গেলুম, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমি দৈনিক সত্য-সেবক পত্রিকার এক রিপোর্টার। আমাদের কাগজেই একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছিল। জানতুম, অদ্ভুত যা কিছু – তাতেই কর্নেলের কৌতূহল। উনি নাক না গলিয়ে থাকতে পারবেন না। আর এই খবরটা শুধু অদ্ভুত নয়, রীতিমতো অবিশ্বাস্য!

তো, আমাকে দেখেই বুড়ো হাসতে হাসতে বললেন—এস জয়ন্ত! এক্ষুনি তোমার কথা ভাবছিলুম। নিশ্চয় তুমি সেই ভূতুড়ে টুপির ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ!

বললুম—ভূতুড়ে টুপি, না জ্যান্ত টুপি?

—একই কথা। বলে কর্নেল খবরের কাগজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না জয়ন্ত? চোঙার মতো সূচলো ডগাওয়ালা এই ধরনের টুপি ক্রিস্টমাসের পরবে পরা হয়। আবার সার্কাসের ক্লাউনরাও এমন টুপি পরে ভাঁড়ামি করে। সেই টুপি কি না ইচ্ছেমতো চলে বেড়ায়। লাফায়। নাচে। বিছানায় ঘুমোয়। খাবার টেবিলে গিয়ে খেতে বসে। ইজিচেয়ারে আরামে গড়ায়। খাসা! ভাবা যায় না!

টুপির মালিক যে ঘাবড়ে যাবেন, তাতে সন্দেহ কি!

বললুম—শুধু তাই নয় কর্নেল। বাগানে গিয়ে গোলাপ গাছে চড়ে চমৎকার দোল খায় ব্যাটা।

কর্নেল খুব হাসলেন। তারপর বললেন—বসো। এক্ষুনি টুপির মালিক মিঃ গজেন্দ্রকিশোর সিংহরায় এসে পড়বেন। একটু আগে আমায় ফোন করছিলেন।

কর্নেলের পরিচারিকা মিস এ্যারাথুন একটা ট্রেতে কফি রেখে গেল। কফির পেয়ালায় সবে মুখ দিয়েছি, দরজায় ঘণ্টা বাজল। তারপর এক প্রকাণ্ড দশাসই চেহারার স্যুট পরা ভদ্রলোক ঢুকলেন। ওঁর হাতে একটা কিটব্যাগ। আমাকে নমস্কার করলেন, আর কর্নেলের সঙ্গে করলেন হ্যাণ্ডশেক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল। সোফায় গম্ভীর মুখে উনি বসলে কর্নেল বললেন—মিঃ সিংহরায়, বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?

সিংহরায় বললেন—আপনাকে ফোনে তো সবই বলেছি কর্নেল। নতুন করে কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা আজ তিন দিন ধরে সত্যি সত্যি ঘটছে। খবরের কাগজে তো দূরের কথা, বাড়ির কাকেও আমি বলিনি। অথচ কি ভাবে ফাঁস হয়ে গেল, কে জানে! খবরের কাগজেই বা কে খবরটা দিল—কিছু বুঝতে পারছিনে! সেইজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি।

কর্নেল মুখ খোলার আগে আমি অবাক হয়ে বললুম—খবরটা নিশ্চয় কোন রিপোর্টারকে কেউ দিয়েছে! না দিলে কাগজে বেরোতেই পারে না।

সিংহরায় উদ্বিগ্নমুখে বললেন—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কি ভাবছিলেন। বললেন—হুম! কিন্তু টুপিটা যে ওই সব অদ্ভুত কাণ্ড করছে, তা তো সত্যি?

সিংহরায় জবাব দিলেন—একেবারে হুবহু সত্যি। টুপিটা কিনেছি গত বিষ্যুৎবার চৌরঙ্গীর একটা নীলামের দোকানে। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখা আমার বাতিক। টুপিটা

দেখতে অদ্ভুত লাগল। পঁচিশটাকা থেকে দর হাঁকাহাঁকি শুরু হল। তিরিশে উঠেই অন্যরা ছেড়ে দিল। শুধু একজন···

—হুম! বলুন।

—একজন অবাঙালী ভদ্রলোক ছাড়ল না। দর চড়াতে থাকল। তাই আমারও জেদ চড়ে গেল। শেষ অব্দি রোখের মাথায় তেরোশো টাকা হাঁকলুম। তখন লোকটা সরে গেল। টুপি নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরলুম। এবং তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকেই টুপি খেল দেখানো শুরু করল। ড্রয়িংরুমের কোনায় একটা ছোট্ট টেবিলে ওটা রেখেছিলুম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ দেখি টুপিটা টেবিলের ওপর চলতে চলতে নিচে পড়ে গেল। তখনও সন্দেহ হয়নি। ওটা সেখানেই তুলে রেখে ওপরের ঘরে গেছি, খাওয়াদাওয়া করেছি। শুতে গিয়ে দেখি, আশ্চর্য! টুপিটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সবাইকে জিগ্যেস করলুম—কেউ কিছু জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল শুক্রবার রাতে। টুপিটা শোবার ঘরেই রেখেছিলুম। রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে খসখস শব্দ শুনে সুইচ টিপে টেবিলল্যাম্প জ্বালালুম। দেখি—টুপিটা মেঝেতে দিব্যি হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে জানলার দিকে যাচ্ছে। তারপর চোখের সামনে সেটা জানলা গলিয়ে লাফ দিল। বিশ্বাস করুন কর্নেল, যা বলছি—এর এতটুকু মিথ্যে নেই।

—হুম! বলুন, বলুন!

মিঃ সিংহরায়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। দম নিয়ে বললেন—তক্ষুনি টর্চ আর পিস্তল নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম, টুপিটা বুগন-ভিলিয়ার গাছে কাত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল গত রাতে। টুপিটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা গোলাপ গাছে চড়ে বসেছে। আজ ভোরবেলা মালী দেখতে পেয়ে···

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—হুম বুঝেছি। টুপিটা কি এনেছেন?

—এনেছি! এই বিদঘুটে জিনিস আর কাছে রাখতে একটুও

ইচ্ছে নেই কর্নেল।...বলে সিংহরায় কিটব্যাগ খুলে একটা চোঙার মতো টুপি বের করলেন। প্রকাণ্ড টুপি। কালোরঙ। সূচলো ডগায় একটা রেশমি টুপি আছে। দুপাশে দুটো দুষ্টুহাসিভরা মুখ—একদিকেরটা ছেলের, অন্য দিকেরটা মেয়ের। আমার নাকে কড়া গন্ধ লাগল। নিশ্চয় টুপির গন্ধ।

কর্নেল টুপিটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন—হুম, বেশ ওজন আছে দেখছি। শক্ত সমর্থ মাথা না হলে ঘাড় ব্যথা করবে। কিন্তু এ টুপি তো প্রশান্ত মহাসাগরের মাকাসিকো দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা পরে। বুনো বেড়ালজাতীয় পশুর চামড়ায় তৈরি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—কর্নেল, কর্নেল! গত বছর মাকাসিকোতে রাজাকে হটিয়ে এক সেনাপতি সিংহাসন দখল করেছিল না? রাজা অনুহিটিকি পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন! খুব খুনোখুনি আর লুঠপাট হয়েছিল রাজপ্রাসাদে।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অপূর্ব জয়ন্ত, অপূর্ব! তাই-ই তো বটে। হাজার হলেও তুমি খবরের কাগজের লোক! ইয়ে মিঃ সিংহরায়, তাহলে টুপিটা আমার আছে আপাতত থাক। আপত্তি আছে?

সিংহরায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।—মোটেও না! বরং বেঁচে গেলুম, কর্নেল। বাপস! এখনও আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে! ওই ভূতুড়ে টুপি এবার হয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলবে মশাই!

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। আমি সন্ধ্যার দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। জয়ন্তও যাবে আমার সঙ্গে। কেমন!

সিংহরায় মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন।

কথামতো সাড়ে পাঁচটায় আবার কর্নেলের ফ্ল্যাটে গেলুম। দেখি, আমারই অপেক্ষা করছেন উনি। একটু হেসে বললুম—টুপিটা নিশ্চয় আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্ত। এবং সেটাই

আশ্চর্য !

—কেন, কেন ?

—টুপিটা যদি সত্যি ভূতুড়ে হবে, তাহলে সবখানেই ভূতুড়ে কাণ্ড করবে। অথচ আমার ঘরে এসে একেবারে শান্ত খোকাবাবুটি বনে গেল ! কোন মানে হয় না জয়ন্ত !

তাহলে কি সিংহরায় মিথ্যে বলছেন ? খবরের কাগজেও কি উনি নিজেই খবরটা দিয়েছেন ? কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কি কর্নেল ? সিংহরায় কেন এমন আজগুবি ঘটনা রটাচ্ছেন ?

—সব কিছু জানতেই ওঁর বাড়ি যাচ্ছি আমরা। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।···

নিউ আলিপুরে সিংহরায়ের ইভনিং লজে যখন আমরা পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা ছটা। বিশাল বাড়ি। চওড়া লন, ফুলবাগিচা, টেনিস কোর্ট আছে। আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। টুপিটা কর্নেলের হাতে ছিল। সোফার এককোণে রেখে পাশেই বসলেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল। দেখলুম, কর্নেল টুপির কথা মোটেও তুললেন না। ঘরের নানান শিল্পসামগ্রী নিয়ে পুরাতত্ত্বে চলে গেলেন। ওসব পণ্ডিতি ব্যাপার আমি বুঝিনে। চুপচাপ বসে রইলুম।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল টুপিটা নড়ছে। নড়তে নড়তে সোফার পিছনে চলে যাচ্ছে। ঘরে আলো খুব উজ্জ্বল নয়। হাল্কা ধূসর আলো জ্বলছে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। এত অবাক, আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। টুপিটা সোফার পিছন দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে এগোচ্ছে। ডগার টুপিটা ঝাকুনি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওটার গতি বাড়ল। দরজার কাছে যেতেই আমি এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল ! কর্নেল ! টুপি ! টুপিটা পালাচ্ছে !

সিংহরায় হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। কর্নেলকে দেখলুম, মিটিমিটি হেসে এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তখন টুপিটা দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়েছে!

কর্নেল দেখলুম দরজার কাছে গিয়েই আচমকা লাফ দিলেন। তারপর উনিও অদৃশ্য। এতক্ষণে আমার হুঁস হল যেন। দৌড়ে বেরিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

অমনি লনের ওদিকে গেটের কাছে দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ হল। নিশ্চয় কেউ গুলি ছুঁড়ল। দারোয়ান চাকর-বাকর চেঁচিয়ে উঠল। দৌড়াদৌড়ি শুরু হল! গেটে গিয়ে দেখি, কর্নেল একহাতে টুপি অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি। রুদ্ধশ্বাসে বললুম—কি ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেল বললেন—আমার কাছে নয়, ওখানে সব রহস্য পড়ে আছে, জয়ন্ত! ওই দেখ, দেখতে পাচ্ছ?

কর্নেলের সামনে নুড়িবিছানো রাস্তায় একটা ছোট্ট বিলিতি কুকুর মরে পড়ে আছে। বুকের কাছে রক্তের ছোপ। সিংহরায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—জিমি! জিমি! কে তোকে খুন করল?

কর্নেল ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন—মিঃ সিংহরায়, জিমিকে ওর আসল মালিকরা এইমাত্র গুলি করে মেরে গেল। জিমিকে আপনি নিশ্চয় সদ্য কিনেছিলেন! তাই না?

সিংহরায় উঠে দাঁড়ালেন। —হ্যাঁ। যেদিন টুপিটা কিনি সেদিনই বিকেলে একটা লোক বেচতে এনেছিল। কিন্তু আমি তো এসব কিছু বুঝতে পারছি না!

—দেখুন, এই টুপির মধ্যে নিশ্চয় কিছু দামী মণিমুক্তো লুকনো আছে। টুপিটা হাতাবার জন্যেই জিমিকে ওরা আপনার কাছে বেচেছিল। টুপিতে একরকম গন্ধ মাখানো আছে। মাকাসিকো দ্বীপের একজাতের ফুলের গন্ধ। বহুকাল টিঁকে থাকে এই গন্ধ। ওরা এই গন্ধ যোগাড় করে জিমিকে শুঁকিয়ে খুব ট্রেনিং দিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। তবে ট্রেনিং জিমির তেমন রপ্ত হয়নি। সময় যথেষ্ট পায়নি। তাই টুপিটা ওদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ওরা এই ক'দিন রাস্তায় ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করেছে বেচারা জিমির !

সিংহরায় হতভম্ব হয়ে বললেন—তাহলে টুপির তলায় জিমিটাই ঘুরে বেড়াত ?

—অবশ্যই। ভূতুড়ে টুপির রহস্য হচ্ছে এই। আর খবরের কাগজে খবর দিয়েছিল ওরাই—যাতে টুপিটা হারালে ভূতের ঘাড়েই দোষটা চাপানো যায়। বুঝলেন তো ? অট্টুকুন কুকুর—খাড়াই মোটে ছ'ইঞ্চি ! টুপির তলায় ঢুকলে তো ওকে দেখা যাবে না।

এরপর আমরা ড্রইংরুমে ফিরে গেলুম। ছুরি দিয়ে টুপির ভেতরটা চিরে দিতেই গুচ্ছের রঙীন পাথর ঠিকরে পড়ল। চোখ ধাঁধানো রঙ সব। আমি লাফিয়ে উঠলুম—কর্নেল ! রাজা আনুহিটিকি পালাবার সময় অনেক ধনরত্ন নিয়ে যান। পথে অনেক খোওয়া গিয়েছিল নাকি। এই টুপিটার মধ্যেও কিছু ছিল দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে শুধু বললেন—হুম !

মনে মনে বললুম—ওহে বুড়োঘুঘু! সত্যি, তোমার তুলনা নেই।...

সিঙ্গিমশাই অর্থাৎ নন্দদুলাল সিংহ, যাঁকে সবাই বলে নাদু সিঙ্গি—ঠিক কবে থেকে এবং কেন যে বেড়াল পুষতে শুরু করেন, বলা কঠিন। কেউ বলে, তিনকুলে কেউ নেই, অত বড় বাড়িতে একা থাকেন। তাই বেড়াল পোষার শখ। এই বুড়ো বয়সে একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে।

আবার কেউ বলেন, বন্ধু হাঁদু ডাক্তার অর্থাৎ হৃদয়রঞ্জন সর্বাধি-

কারীর পরামর্শে। বেড়াল নাকি বাতের জায়গা চেটে দিলে রোগটা দিব্যি সেরে যায়। সিঙ্গিমশাইয়ের হাঁটুর ওই বাত সারাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল যে! এখন বেড়াল পুষে রোগ সারিয়ে কেমন আনন্দে আছেন! প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে নদীর ধারে মাঠটায় ছোটাছুটি করেন। দেখলে কে বলবে উনি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ?

সব কথাই সত্যি। এ মফস্বল শহরের রিটায়ার্ড উকিল সিঙ্গি-মশায়ের সম্মানও প্রচুর। মাঝে মধ্যে প্রায় তাঁকে নানান ফাংশনে সভাপতি হয়ে যেতে হয়। কখনও মন্ত্রী বা দেশনেতারা এলেও তাঁর সভাপতি হবার জন্যে ডাক পড়ে। পুজো বা একজিবিশনে ফিতে কেটে উদ্বোধনও করতে হয় তাঁকে।

কিন্তু আজকাল আগের মতো আর একা যান না। সঙ্গে থাকে—আবার কে? এক গাদা বেড়াল। বেড়ালগুলো কিন্তু ভারী সভ্য। গম্ভীর মুখে সভায় বসে থাকে। দরকার হলে দুই থাবা ঠুকে হাততালিও দেয়।

হ্যাঁ, নাদু সিঙ্গি আজকাল বেড়াল ছাড়া থাকেন না। খেতে শুতে উঠতে বসতে তাঁর সঙ্গী একপাল বেড়াল। প্রথমে নাকি একজোড়া পুষেছিলেন। তারপর মা ষষ্ঠীর দয়ায় এখন সিঙ্গি বাড়ির উঠোনে বেড়াল, ঘরে বেড়াল, জানালায় বেড়াল, ছাদের কার্নিশে দরজায় বাথরুমে শোবার ঘরে রান্নাঘরে সবখানে গিজগিজ করছে বেড়াল বংশ।

শীতের দুপুরে দেখা যায়, সিঙ্গি বাড়ির ছাদে ওরা দিব্যি রোদ পোয়াচ্ছে। তখন বোঝা যায়, নাদু সিঙ্গিও আরাম কেদারা পেতে রোদ নিচ্ছেন ছাদে।

ভোরবেলা তিনি যখন নদীর ধারের খেলার মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছেন, তখনও বেড়ালগুলো সঙ্গে আছে।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে বিকেলবেলা। নাদু সিঙ্গি যে মান্ধাতা আমলের ফোর্ড গাড়িটি চেপে আদালতে যেতেন, তা এখনও

রয়েছে। গাঁক গাঁক করে দিব্যি সেটা ছুটতে পারে। এবং বিকেলবেলা বড় রাস্তা দিয়ে তু'চার মাইল চক্কর দিয়ে বেড়ানোর অভ্যাস তাঁর আছে। তখন দেখা যায়, গাড়ির ছাদে, পাদানিতে, বনেটে আর ভেতরে বেড়ালগুলো চুপচাপ বসে আছে।

এত সব বেড়ালের নাওয়া খাওয়া দেখাশোনার জন্যে কয়েকজন লোক রেখেছিলেন গোড়ায়। কিন্তু তারা যেমন ফাঁকিবাজ, তেমনি সব চোট্টা। বেড়ালের তুধ পনির মাছ মাংস ইত্যাদি খাবারে ভাগ বসাতে শুরু করেছিল। ওদিকে বেড়ালগুলো শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাইকে তাড়িয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন এক বেড়াল বিজ্ঞানীকে, মোটা টাকা মাইনে দিয়ে রাখলেন।

এই ভদ্রলোকের নাম ডক্টর ডি. জি. ঢাউল এম. সি. এস., টি. এ. ই.। রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা, মাথাটা প্রকাণ্ড। লম্বা ঝুলো গোঁফ আর এক চিলতে ছাগলদাড়ি আছে মুখে। ঢোলা পাতলুন, কোট আর টাই পরে সব সময় বেড়ালদের ট্রেনিং দিচ্ছেন।

পাশের বাড়ির হাঁতু ডাক্তারের ভাগ্নে ন্যাপলা ওরফে নেপাল শহরের তুঁদে খচ্চর ছেলে। ক্লাস নাইনে পড়ে। বিচ্ছুর মতো চেহারা। সে ডঃ ঢাউলের সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়েছিল। প্রথমেই লম্বা এক নমস্কার ঠুকে স্যার বলে বেড়াল বিজ্ঞানীর মন গলিয়ে দিয়েছিল ন্যাপলা। তারপর আস্তে আস্তে নিজ মূর্তি ধরেছিল।

—স্যার, ঢাউল পদবীটা তো কোথাও শুনিনি! আপনার নাম ডঃ দোলগোবিন্দ ঢোল, তাই না স্যার?

ডঃ ঢাউল একটু বিরক্ত হয়েছিলেন নিশ্চয়। বলেছিলেন, সেক্সপীয়র পড়েছ? পড়লে জানতে, নামে কী আসে যায়?

—স্যার 'এম. সি. এস.'টা কি মাস্টার অফ ক্যাটস সাইকলজি?

ট্যারা চোখে তাকিয়ে ডঃ ঢাউল শুধু একবার 'ঘোঁত' গোছের কী একটা আওয়াজ করেছিলেন।

—আর স্যার, 'টি. ই.'-টা হচ্ছে টাইগারস্ আন্টি এক্সপার্ট অর্থাৎ

বাঘের মাসীদের বিশেষজ্ঞ ?

ডঃ ঢাউল এবার চটে উঠেছিলেন – দ্যাখো হে ছোকরা, ডঃ ডি. জি. ঢাউলকে তোমাদের এই এঁদো মফস্বলে এসব বাজে কথা বলার সাহস হয় ! তোমরা কী খবরই বা রাখো ! জানো, বিশ্বে যে কজন বেড়ালতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞ আছেন, তাঁদের একজন আমি ? জানো তুমি, যে সেভেনথ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাটস সেমিনারে প্রিজাইড করেছিলুম আমি ? খবর রাখো, ডুরেনটনভনহর্ক ইউনিভার্সিটিতে ডঃ হেটসপিটসকভ রাস্কেলভের সহকারী হয়ে সাত বচ্ছর বেড়ালের কটা প্রাণ আছে, তাই নিয়ে গবেষণা করেছিলুম ?

ন্যাপলা এবার কৌতূহলী হয়েছিল – কী বললেন স্যার, কী বললেন স্যার ? বেড়ালের কটা প্রাণ ! বেড়ালদের প্রাণ থাকে স্যার ?

তার ছাত্রসুলভ আগ্রহ দেখে ডঃ ঢাউলের মেজাজ একটু ভাল হয়েছিল। বলেছিলেন – দেখো, কথায় বলে বেড়ালের ন'টা প্রাণ।

– কেন স্যার, কেন স্যার ?

– তুমি কিস্যু জানো না দেখছি। বেড়াল খুব সহজে মরে না। ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে ফেলে দাও, দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে হেঁটে যাবে। বস্তায় ভরে আড়াইশোবার মুগুর মারো। কিন্তু গেরো খুললেই দেখবে, ম্যাও করে বেরিয়ে লাফ দিয়ে পালাবে। বেড়াল মারা সহজ নয়। তা, আমার গবেষণার বিষয় ছিল, বেড়ালের প্রাণের সংখ্যা সত্যি সত্যি ন'টা না তার কম কিম্বা বেশী। বলে ডঃ ঢাউল এক টিপ নস্যি নিয়েছিলেন।

ন্যাপলা বলেছিল – কী দেখলেন স্যার ?

– দেখলুম কী বলছ হে। প্রমাণ করলুম যে বেড়াল একটা প্রাণ নিয়েই জন্মায়। কিন্তু প্রতি মাসে আরও একটা করে প্রাণ গজায় তার। কাজেই যে বেড়ালের বয়স ন'মাস, তার ন'টা প্রাণ। কিন্তু যার বয়স তিন বছর, তার কটা হয় ?

– ছত্রিশটে স্যার।

– রাইট। অঙ্কে তোমার মাথা আছে।

– তা, স্যার, এত বড় আবিষ্কারের জন্যে আপনাকে নোবেল প্রাইজ দিলো না ?

ডঃ ঢাউল দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন – আর বোলো না। নামটা প্যানেলে উঠলো। সব ঠিকঠাক। অ্যানাউন্স করতে যাচ্ছে, হঠাৎ সুইডেনের এক বিজ্ঞানী ডঃ টানিকেন ফন কিনকিনা বেমক্কা বাগড়া দিয়ে বসলেন।

ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ির ছাদ থেকে হাঁদু ডাক্তার ন্যাপলাকে ডাকতে শুরু করেছিলেন – ন্যাপা, আই ন্যাপা, নেপো! শীগ্‌গিরি আয় হারামজাদা!

নেপালচন্দ্র মামাকে যমের মতো ভয় করে। তক্ষুণি দৌড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে।

বেশ চলছিল সব। হঠাৎ একদিন সিঙ্গিমশাই আর তাঁর বন্ধু হাঁদু ডাক্তারের সঙ্গে জোর মনকষাকষি হয়ে গেল।

সিঙ্গিমশাই বেড়াল পোষার পর থেকে স্বভাবতঃ হাঁদুবাবুর বাড়িতে ইঁদুরের উৎপাত বেশ বেড়ে গিয়েছিল। কারণ সিঙ্গি বাড়ির সব ইঁদুর পালিয়ে ডাক্তার বাড়ির আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল। সেই বাস্তুহারা ইঁদুরগুলোর জ্বালায় হাঁদুবাবু অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তখন ন্যাপলাই বললো, – মামা, আমরাও বেড়াল পুষি!

হাঁদুবাবু রুগীপত্তর নিয়ে এত ব্যস্ত মানুষ। বললেন – বেড়াল পুষলে ইঁদুর পালাবে জানি। কিন্তু এ তো একটা বেড়ালের কম্ম নয় রে নেপো। কম পক্ষে লাখখানেক ইঁদুর জড়ো হয়েছে। দিনে দিনে বাড়ছে। এত ইঁদুরের মধ্যে একটা বেড়াল নির্ঘাৎ বেঘোরে মারা পড়বে। পুষতে হলে নাহুর মতো শ'খানেক পুষতে হয়। কে তাদের দেখাশোনা করবে ? আমি বাপু পয়সা খরচ করে সায়েন্টিস্ট রাখতে পারব না, বলে দিচ্ছি।

নেপাল বলল – কিচ্ছু দরকার নেই মামা। সে আমি ম্যানেজ করবো'খন।

নেপাল জানে, সিঙ্গিমশায় প্রাণ গেলেও একটা বেড়াল ধারেও দেবেন না। তাছাড়া, ডঃ ঢাউল এসে অলিম্পিকের খেলোয়াড়দের মতো বেড়ালগুলোর গায়ে নম্বর দেগে দিয়েছেন। চুরি করে আনলেও ধরা পড়ে যাবে। অথচ অমন ট্রেনিং পাওয়া ভালো জাতের বেড়াল ছাড়া কাজও হবে না। তা বেড়ালগুলোকে যদি সিঙ্গিমশাই ও ডঃ ঢাউলকে বলে এক রাত্তিরের জন্যে নেমন্তন্ন করা হয়, তাহলে কি কাজ হবে না? আলবাৎ হবে, খুব হবে। মামাকে এখন রাজী করানো দরকার। কিছু খরচ তো হবেই। অতিথিদের দুধ মাছ ইত্যাদি না খেতে দিলেই বা চলবে কেন?

হাঁদুবাবু ব্যস্ত মানুষ। শুনে বললেন—কথাটা মন্দ নয়। তা তুই যা ভালো বুঝিস কর বাবা। টাকা যা লাগবে লাগুক। ব্যাটাচ্ছেলে ইঁদুরগুলো কাঁড়ি কাঁড়ি সেঁকো বিষ হজম করে দিব্যি বেঁচে আছে রে! সিঙ্গির বেড়াল ছাড়া আর উপায় সত্যি নেই। তাই কর নেপো।

হুকুম পেয়ে শ্রীমান নেপাল যা আয়োজন করলো, তা রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ। মণটাক দুধ আর দেড়-মণটাক ছোট বড় নানা জাতের মাছের অর্ডার দিয়ে এলো তক্ষুণি। বেস্পুৎবার বলে মাংসটা পাওয়া যাবে না।

সিঙ্গিমশায় রাজী হয়ে গেছেন শুনেই ডঃ ঢাউলও খুব খুশী। বেড়াল-বিজ্ঞানে, লেখা আছে না মাঝে মাঝে ওদের নেমন্তন্ন খাইয়ে খাইয়ে মুখ বদল করা ভালো। তাতে আহারে রুচি বাড়ে। জীবনে বৈচিত্র্য আসে। একঘেঁয়েমি কারই বা ভালো লাগে?

নাদু সিঙ্গি বললেন—এ তো উত্তম প্রস্তাব বাবা ন্যাপা। তোমরা আমার নিজের লোক। আমার বেড়ালগুলো তোমাদের বাড়ি একবেলা খাবে, সে তো আনন্দের কথা! এসো'খন। সন্ধ্যেবেলা এসো। ডঃ ঢাউল নিয়ে যাবেন ওদের।

কথামতো সন্ধ্যে সাতটায় ডঃ ঢাউল সেই বেড়ালবাহিনী নিয়ে ডাক্তার বাড়ি ঢুকলেন।

সে এক এলাহি কাণ্ড করেছে নেপাল। সানাই বাজছে মাইকে। ডেকোরেটার এসে সাজিয়ে দিয়েছে বিয়েবাড়ির মতো। আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কার্পেট পড়েছে সদর দরজা থেকে উঠোন অব্দি। নেপালের বন্ধুরা ভাঁড়ার ঘরে সাঁড়াশি আর লাঠি হাতে খাবার পাহারা দিচ্ছে। ইঁদুরগুলোকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই কিনা।

হাঁদু ডাক্তারের একরত্তি বংশের সলতে মেয়ে রুমকি শাঁক বাজাতেও চেষ্টা করলো। কিন্তু কতটুকুই বা গাল ওর? ফ্যাঁস করে উঠলো মাত্র। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। ডঃ ঢাউল বললেন – নাম্বার ২১, ৩২, ৪২, ৪৪ আর ৫৫ পেটের রোগে ভুগছে বলে আসেনি। বাদবাকি সবাই এসেছে।

বেড়ালগুলো তাঁর ছড়ির ইশারায় উঠোনে সার বেঁধে বসে পড়লো। হাঁদু ডাক্তার তারিফ করলেন – হ্যাঁ, ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে বটে। এ না হলে এক্সপার্ট বলে কাকে?

ডঃ ঢাউল তখন মাঝে মাঝে তম্বি করছেন – হ্যালো ছত্রিশ নম্বর, অমন করে বসে না, ভদ্রভাবে বসো! উনত্রিশ নম্বর! আবার? বলছি পা নামাও। এখন গাল চুলকোবার সময় নয়। এক নম্বর! তুমি ও কি করছ? হাই তুলছ কেন? খাবে, তারপর তো ঘুমোবে! এই নাম্বার ফোরটিন! ফের গোঁফ চুলকোয়! একি গোঁফ চুলকোবার সময়? তাছাড়া কখনো নখে চুলকোবে না বলে দিয়েছি না? নখে কত সব জীবাণু থাকে! সাবধান!

নাম্বার নাইন এ সময় ম্যাও করে উঠলো। ডঃ ঢাউল তেড়ে গিয়ে বললেন – কী হলো? কাঁদছ কেন? খাবার সময় কান্না? ছিঃ, কাঁদে না! অসভ্য বলবে!

কিন্তু খেতে দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন? সিঙ্গিমশায়ও সেজে-গুজে এতক্ষণে এলেন। হাঁদু ডাক্তারও সেজেগুজে রয়েছেন। দুই বন্ধুতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়োজন দেখছিলেন। হঠাৎ সেই সময় নেপাল ভাঁড়ার ঘর থেকে দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলো – মামা, মামা, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

—কী? কী? কী হয়েছে?

—হয়েছে সাংঘাতিক কাণ্ড। ভোম্বল, ভোঁদা, নান্টু, মন্টু, লটকন—অতগুলো খচ্চর ছেলের পাহারা এড়িয়ে ইঁদুরগুলো সব দুধ আর মাছ সাবাড় করে দিয়েছে কখন। ঢাকনা খুলতে গিয়ে দেখে, শুধু ইঁদুরে গিজগিজ করছে। কটা মারবে? মারতে গিয়ে ভোম্বলের পায়ে কামড়ে দিয়েছে। ভোঁদার হাতের আঙুল জখম। নান্টুর কানের লতি নেই। মন্টুর নাকের ডগা নেই। আর লটকনের হাফপেন্টুল আর জামার ভেতরে একগুচ্ছের ঢুকেছে, বের করা যাচ্ছে না। সে ক্রমাগত চ্যাঁচাচ্ছে হাত পা ছুঁড়ে। সব মিলিয়ে ভাঁড়ার ঘরে এবার দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

শুনেই হাঁদু ডাক্তার গর্জে উঠলেন—ডঃ ঢাউল, ডঃ ঢাউল! ওদের অ্যাটাক করতে বলুন!

ডঃ চাউল অমনি ছড়ি নাচিয়ে চেঁচালেন—এভরিবডি কুইক! অ্যাটাক হারামজাদা র‍্যাটস। ক্যাটস টু র‍্যাটস—ক্যাটস টু র‍্যাটস!

আশ্চর্য, বেড়ালগুলো নড়লও না।

সিঙ্গিমশাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখটা গম্ভীর। হাঁদু ডাক্তার বললেন—সিঙ্গি, সিঙ্গি, সিঙ্গি! তোমার বেড়ালগুলো তো ভারী অকম্মার ধাড়ি দেখছি! অমন কাওয়ার্ড বেড়াল তো দেখা যায় না! এ কী পুষেছ হে? ছিঃ ছিঃ! নেমকহারামগুলোকে বস্তায় ভরে এক্ষুণি নদীর ওপারে ফেলে দিয়ে এসো গে!

শুনে সিঙ্গিমশায়ের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। অমনি দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—নেমকহারাম? আমার বেড়াল নেমকহারাম? না—তোমার ইঁদুরগুলো নেমকহারাম? যত সব অভদ্র অসভ্য বদমাশ বাড়িতে পুষে রেখেছো আর আমার বেড়ালের দোষ দিচ্ছ? আসলে বুঝেছি, এ সবটাই চালাকি! নেমন্তন্ন করে এনে অপমান! এ দস্তুরমতো ষড়যন্ত্র! আমি উকিল, তোমার নামে আমি মানহানি আর ক্ষতিপূরণের মামলা করবো, তবে আমার নাম নাদু সিঙ্গি। চলে আসুন ডঃ ঢাউল! বুঝতে পারছেন না এখনও, সব চালাকি!

আসলে আমার বেড়াল দেখে হাঁদুর হিংসে হয়। তাই কৌশলে অপমান করলো ! হ্যাঁ, বললেই বিশ্বাস করতে হবে যে ইঁদুর দুধ খেয়েছে, মাছ খেয়েছে ? ওরা তো নিরামিশাষী ! ফসলের দানা খায়।

ডঃ ঢাউল উদাত্তকণ্ঠে বক্তৃতা করে বললেন—বছরে কোটি কোটি টাকার শস্য খেয়ে শেষ করে ইঁদুর। রাষ্ট্রপুঞ্জের নথিতে বলা হয়েছে, ইঁদুর যার ঘরে আশ্রয় পায়, সে মানবতার শত্রু ! এই খাদ্যের আকালের যুগে, চালে কাঁকর খেতে যখন দাঁত ভাঙছে, সরকার রেশনে খাদ্য দিতে পারছে না, তখন ইঁদুর যারা পোষে, তাদের মুণ্ডু চাই ! মুণ্ডু চাই !

হাঁদু ডাক্তার গোড়াতেই ক্ষেপে গিয়েছিলেন সিঙ্গির কথায়। এবার শ্লোগান শুনে গর্জালেন শাট আপ ! আমি ইঁদুর পুষেছি, না ওগুলো নাদুর ইঁদুর ?

সিঙ্গি আস্তিন গুটিয়ে বললেন—চোপরাও মিথ্যেবাদী। বাড়ি ডেকে এনে আরও অপমান ? আমার ইঁদুর ? সকাল হতে দাও। এজলাসে হাকিম বসতে দাও, আমি মামলা করবো তোমার নামে !

ডঃ ঢাউল বেড়ালগুলো ডাকিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন। হাঁদু ডাক্তার দু'হাতের বুড়ো আঙুল সিঙ্গির নাকের কাছে তুলে বললেন—কচু করবে ! হাতি করবে ! কলা করবে !

আর সেই সময় হাঁদু ডাক্তারের পায়ের কাছে তিন নম্বর বেড়ালটা এসে ম্যাও করে উঠতেই তিনি এক লাফ দিলেন। তার ফলে দশ নম্বর হুলোর ওপর গিয়ে পড়লেন। হুলো চাপা পড়লো। আর সিঙ্গি মশাই আর্তনাদ করে উঠলেন—খুন ! খুন ! পুলিস পুলিস···

পুলিস আসত কিনা কে জানে, তাঁর ওই চিৎকার শুনেই হয়তো ভাঁড়ার ঘরের দিক থেকে এবার ইঁদুরগুলোকে বেরোতে দেখা গেল। একটা দুটো নয় পালে পালে দলে দলে সাদা কালো ধূসর খয়েরী নানান জাতের ইঁদুর, কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, কেউ মোটা কেউ রোগা—যত রকম ধেড়ে আর নেংটি পিল পিল করে বেরিয়ে এলো

এবং মাইকের সানাইয়ের তালে তালে নাচ জুড়ে দিলো।

সম্ভবতঃ গোপনে ভাঁড়ার ঘরের ওই আয়োজনের খবর শহরময় পাচার হয়ে গিয়েছিল ইঁদুর কুলের মধ্যে। তার ফলে হাজার হাজার ইঁদুর এসে কখন ঘাপটি পেতে বসেছিল। এখন আচমকা তারা উঠোনে এসে পড়তেই ডঃ ঢাউল মরীয়া হয়ে আবার চেঁচালেন—ক্যাটস টু র‍্যাটস! ক্যাটস টু র‍্যাটস!

একদল ইঁদুর তাঁর গায়ে চড়তে শুরু করেছে তখন। তিনি হাত পা ছুঁড়ছেন। সিঙ্গিমশায়ের ওপরও হামলা শুরু হয়েছে ওদিকে। তিনিও পুলিস পুলিস করে পাড়া মাথায় করে যাচ্ছেন আর দু'হাত তুলে নাচছেন। তারপর শেষ অব্দি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকলেন।

গতিক দেখে হাঁদু ডাক্তার তার মেয়ে রুমকির হাত ধরে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর ভেতর থেকে ডাকতে লাগলেন—নেপো, ন্যাপা রে! পালিয়ে আয়, তোরা পালিয়ে আয়!

ন্যাপা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তখন গতিক বুঝে অন্য মতলব এঁটেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, বেড়ালগুলোও আচমকা এত লাখে লাখে ইঁদুরকে নাচতে দেখে এমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছে যে কহতব্য নয়। তারা প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে নাচ দেখছে শুধু।

সেই সময় আচমকা বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। নেপাল মেন সুইচটা অফ করে দিয়েছে। ঘন কালো রঙে ডুবে গেল সারা বাড়ি। আর বেড়ালগুলো এতক্ষণ যা পারছিল না ডঃ ঢাউলের ভয়ে কিংবা চক্ষুলজ্জায়, তা অর্থাৎ নাচ জুড়ে দিল।

তারপর আর কী! অন্ধকারে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। সিঙ্গি-মশাই, ডঃ ঢাউল বেড়ালগুলো আর ইঁদুরগুলো মিলে ভূতের কেত্তন চলেছে। অন্ধকারে শুধু নানারকম টুইস্ট নাচের ভূতুড়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সিঙ্গিমশাই শুধু চেঁচিয়ে উঠছেন—পুলিস!

আলো! মামলা করবো। দমকলে ফোন করে দাও!

আর ডঃ ঢাউল চেঁচাচ্ছেন—ক্যাটস টু র‍্যাটস, ক্যাটস টু র‍্যাটস।

দমকল আসেনি কিংবা মামলাও অবশ্যি করেননি নাদু সিঙ্গি। কিন্তু চিরজীবনের বন্ধু হাঁদু ডাক্তারের মুখ দেখা সেই থেকে বন্ধ। আর হাঁদুবাবু টের পেয়ে গেছেন যে সিঙ্গিকে জব্দ করতে হলে তার বেড়াল-গুলোকে জব্দ করতে হবে এবং তা করতে হলে এমন সরেস জাতের ইঁদুর পোষা মঙ্গল। এ একরকম শাপে বর হলো। এখন তাঁর ইচ্ছে, সকাল বিকেল গাড়ি চাপিয়ে সিঙ্গির মতো ইঁদুর নিয়ে বেরোবেন। কিন্তু তার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া যে দরকার। ইঁদুর-বিজ্ঞানী চাই একজন।

শেষ অব্দি তাও জুটে গেছে। আবার কে? সেই ডঃ ডি. জি. ঢাউল। কারণ ওই কাণ্ডের পর সিঙ্গি বাড়ি থেকে ওঁর চাকরি যায়। বেকার বিজ্ঞানীকে তক্ষুণি চাকুরি দিয়েছেন হাঁদু ডাক্তার। এখন ন্যাপলা বড়াই করে বলে বেড়ায়—আমাদের ডঃ ডি. জি. ঢাউল, যে সে নন—দস্তুরমতো ইঁদুর শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি। তার ওপর এম. আর. এস. অর্থাৎ মাইস অ্যাণ্ড র‍্যাট্স সাইকলজিস্ট।

ভোঁদড়কে কোথাও উদবেড়াল, আবার কোথাও জলবেড়াল বলা হয়। এর একটা বড় কারণ, ভোঁদড় বেড়ালের মতনই মাছ খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ভোঁদড় যে পোষ মানে আমি জানতুম না। বনের যেখানে আমার আড্ডা অর্থাৎ কাঠের একটা বাংলোবাড়ি, তার পিছনে পাহাড়ী নদী আছে। ওখানটায় নদী বেঁকেছে। আর

বাঁকের মুখে অতল জলের দহ। কোন স্রোত নেই। ঝকঝকে কালো জল। তলাঅব্দি পরিষ্কার দেখা যায়। ওই জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরা আমার নেশা ছিল।

শরতকালের এক সকালে ছিপ হাতে গিয়ে দেখি, বিশাল বট গাছের শেকড়ে একটা বড় মাছের মুড়ো আটকে রয়েছে। আশে-পাশে কয়েক টুকরো কাঁটাও দেখতে পেলুম। শেকড়টা যেখানে জলে নেমেছে, সেখানে চোখ পড়তেই মনে হল কী একটা লুকোবার চেষ্টা করছে। আমার চোখে পূবের সূর্য নদীর তলায় প্রতিফলিত হয়ে জলে ঠিকরে পড়ছিল। তাই তক্ষুনি বুঝতে পারলুম না ওটা কী।

মাছটা যে ভোঁদড়েই মেরেছে, তা বোঝা গেল। হয়তো এখনও খাচ্ছিল, আমি এসে পড়ায় লুকিয়ে গেছে ঝোপে। তাই একটু তফাতে ছিপ ফেলে বসলুম। কিন্তু একটা চোখ রাখলুম সেদিকে। শেকড়ের তলায় যেটা নড়ছিল, সেটা কি এতক্ষণে বুঝলুম। সেটা একটা পাইথন–যাকে বলে অজগর সাপ। আমি জানতুম, সাপটা বটের তলায় কোন একটা গর্তেই থাকে। মাঝে মাঝে জলে ওর মাথা দেখতে পেতুম। কিন্তু আমার সাড়া পেলেই লুকিয়ে পড়ত।

এখন দেখি সাপটা সাবধানে এবার শেকড় বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? ভোঁদড়বাবাজীর এঁটো খাবে নাকি? মাছের মুড়োটা আন্দাজ কিলো দুইয়ের কম নয়। সাপটার সকালের খাওয়াটা ভালোই হবে মনে হল। কিন্তু অতবড় মাছ যে মেরেছে, সেই চতুর ও শক্তিমান শিকারীকে দেখতেই আমার লোভ হচ্ছিল বেশি।

সাপটা যেভাবে এগোচ্ছিল, আমার হাসি পাচ্ছিল। অত সাবধান হওয়ার কারণ কী? ওই তো পেট ভরাবার মতন চমৎকার সুস্বাদু খাবার। মুখ বাড়ালেই পেয়ে যাবে।

পরক্ষণে আমাকে চমকে দিয়ে গাছের ওপর থেকে কী একটা ঝাঁপ দিল। তারপর সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হল। ফোঁস্ ফোঁস্... খক্ ররর...খ্যাঁক্...খক্ররর...! ঠাহর করে দেখি হ্যাঁ–সেই শিকারী ভোঁদড়টাই বটে। ভোজে ভাগ বসানো সে একেবারে বরদাস্ত করতে

রাজি নয়।

রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। দুজনে লড়তে লড়তে কখনও ঝোপের দিকে এগোচ্ছে। আবার পিছিয়ে জলের দিকেও চলে আসছে। আমার ভয় হল, ভোঁদড়টা যদি বোকা হয়, তাহলে অজগরটার ফন্দি টের পাবে না—জলে নেমে আসবে। কিন্তু এখন আমার করার কিছু নেই। হঠাৎ গাছ থেকে আবার কী একটা ঝুপ করে পড়ল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। অতটুকু ক্ষুদে একটা বাচ্চা ভোঁদড় বুঝি এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব লক্ষ্য করছিল। এতক্ষণে মায়ের বিপদ আঁচ করে মায়ের পাশে দাঁড়াতে এল। বড় ভোঁদড়টা যে মাদী, তা বোঝা যাচ্ছিল। আমার খুব ভাল লেগে গেল ওই বাচ্চাটার এই মাতৃভক্তি এবং মরীয়াপনা। বারবার দুপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে সে সাপটার গায়ে কামড় বসাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সাপটা প্রকাণ্ড লেজ তুলে তাকে পাল্টা আক্রমণ করতেই সে ভড়কে গেল।

ইতিমধ্যে সাপটা বড় ভোঁদড়টাকে প্রায় জলের মধ্যে এনে ফেলেছে। হঠাৎ যেই বড় ভোঁদড়টা বোকার মতন সাপের মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল, অমনি গিয়ে জলে পড়ল। সাপটা যেন এই সুযোগই খুঁজছিল। তার লম্বা বিকট মাথাটা বোঁও করে ঘুরে জলে ডুবতে দেখলুম। তারপর জলের গভীরে সে কী আলোড়ন! বাচ্চাটা তখন জলের ধারে প্রায় দুপায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। বেচারার অসহায় অবস্থা দেখে খুব মায়া হল।

সেই সময় সাপটা এতক্ষণে জল থেকে মাথা তুলল। এবার আমার মাথার চুল শিরশির করে উঠল। বড় ভোঁদড়টার মুণ্ডু কামড়ে ধরেছে সাপটা। ওই অবস্থায় সে আবার ডুবল। কিছুদূরে যখন মাথা তুলল, দেখি তখনও মাথা কামড়ে ধরে ভোঁদড়টাকে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হল ওপারের পাথরের খাড়ির মধ্যে কোন গর্তে ঢুকে জন্তুটাকে গিলে খাবে। রাগে দুঃখে আমি কাঁপতে থাকলুম। কিন্তু বুদ্ধির ভুলে সঙ্গে বন্দুক আনিনি। কী আর করব? পাথর ছুঁড়ে

হয়তো লড়াই থামাতে পারতুম। কিন্তু সারাক্ষণ ব্যাপারটা হাঁ করে শুধু দেখে গেছি। ভাবতেই পারি নি যে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড এ থেকে ঘটতে পারে।

বেচারা মাতৃহারা ক্ষুদে ভোঁদড়টাকে আর দেখতে পেলুম না। মাছধরা রেখে ওকে সেবেলা খুব খোঁজাখুঁজি করলুম। কিন্তু তার পাত্তাই নেই।

তারপর কয়েকটা দিন ওখানে মাছ ধরতে গেছি। দূর থেকে সাপটাকে অনেকবার মাথা তুলতে দেখেছি, কিন্তু ক্ষুদে বেচারার পাত্তা নেই। একদিন মাথায় বুদ্ধি খেলল। একটা ফাঁদ পেতে ওকে ধরা যায় কি না ভাবলুম। আমার মনে হচ্ছিল, কবে না ও বেচারাও রাক্ষুসে অজগরটার পাল্লায় পড়ে যায়! তাছাড়া অত ছোট প্রাণী, এখনও কি নিজের গায়ের জোরে শিকার ধরতে শিখেছে? ও হয়তো না খেয়েই মারা যাবে?

একটা ফাঁদের খাঁচা তৈরি করে জলে কিছুটা ডুবিয়ে রাখলুম। খাঁচার ভেতরে রাখলুম একটা মাছ। তারপর দূরে বসে পাহারায় থাকলুম।

সেদিনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাটা বার তিনেক এল। জলের ধারে ঘুরঘুর করল। মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে চমকে দৌড় দিল ঝোপের দিকে। চার বারের বার সোজা খাঁচার দিকে চলে গেল সে এবং মাছটা ধরতে গিয়েই আটকে গেল ফাঁদে।

এভাবেই 'জিমি' আমার বাড়ির অতিথি হয়ে এল এবং তারপর রীতিমতো ভদ্র সভ্য চমৎকার একটি প্রাণী হয়ে উঠল। স্বাস্থ্যও হয়ে উঠল অপূর্ব।

একমাস পরে জিমি দেখলুম ছেড়ে দিলেও পালাবার নাম করে না। আমার কুকুর জ্যাকির সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যখন জ্যাকিকে নিয়ে শিকারে যাই, জিমির সে কী ছটফটানি! কিন্তু তাকে সঙ্গে নিতে ভয় পাই—ওকে তো জ্যাকির মতন ডাঙ্গার জন্তু শিকারের শিক্ষা দেওয়া হয়নি! বড় জোর ছিপে মাছধরার

সময় ওকে সঙ্গে নেওয়া যায়। তবে নদীর দহে ওকে নিয়ে ভুলেও যাচ্ছি না। শয়তান অজগরটা রয়েছে! ওটাকে অবশ্য মেরে ফেলা যায়। কিন্তু তাতেও আমার কষ্ট হয়। আহা, বুড়ো হয়ে কতকাল বেঁচে আছে সে। ওর ভয়েই তো এদিকে জেলেরা কেউ মাছ ধরতে আসে না। নয়তো কবে দহের মাছ শেষ হয়ে যেত। ফলে জিমিকে বাঁচানো যেত না মাছের অভাবে।

তখন বেশ শীত এসে গেছে জাঁকিয়ে। ঘন কুয়াশার বন সকাল সন্ধ্যা ধূসর হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে জ্যাকি আর জিমিকে নিয়ে বসে থাকি। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। সারারাত নিঃঝুম বনে শীতে কাতর জন্তু-জানোয়ার ডেকে ওঠে। জ্যাকি ও জিমি কম্বলের তলায় শুয়ে নাক ডাকায়।

হঠাৎ একরাতে ঘুম ভেঙে গেল। কেন ভাঙল বুঝতে পারলুম না। কিন্তু পরক্ষণেই জ্যাকি খুব গরগর করতে থাকল। টর্চ জ্বেলে দেখি জ্যাকি কোনার দিকে মেঝেয় ঝুঁকে গর্জাচ্ছে। উঠে গেলুম। তারপর আমি তো বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম। ওরে দুষ্টু! এত ধুরন্ধর হয়েছ তলায় তলায়! সিঁদ কাটতেও শিখে গেছ!

আমার এই ঘরটা মাটি থেকে সাত ফুট উঁচুতে—মেঝের কাঠের পাটাতন। ওই কোনার এক জায়গায় কীভাবে ফাটল ধরেছিল এবং পেরেকগুলোও ছিল মরচে-পড়া। তাই সাবধানতার জন্যে একটা ড্রাম রেখেছিলুম ওখানে। জিমি করেছে কী, ড্রামটার তলায় কবে-কবে পেরেক ছাড়িয়ে কাঠ সরিয়েছে। একটা কাঠের তক্তা ঝুলে গেছে নিচে। আর সে সেই ফাঁক গলিয়ে কোথায় পালিয়েছে!

রাগে দুঃখে অস্থির হলুম। কিন্তু এই শীতের রাতে আর কী করা যাবে? জ্যাকিকে খুব ধমক লাগালুম। কেন সে আগে আমাকে জানায় নি? জ্যাকি খুব দুঃখিত মুখে তাকিয়ে থাকল। মনে হল, সেও ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেনি।

কিন্তু গেল কোথায় জিমি এত রাতে? পালাবার হলে তো দিনে যে কোন সময় পালাতে পারতো!

শুয়ে এই সব ভাবছি, হঠাৎ ড্রামটা নড়ে উঠল। টর্চ জ্বেলে দেখি—হ্যাঁ—শ্রীমান ফিরছে। কিন্তু ও কী, জিমি কী একটা টেনে তোলার চেষ্টা করছে তলা থেকে। টর্চের আলোয় ওর নীল চোখে পাল্টা ধমক দেখলুম—যেন বলছে, আঃ, আলোটা বন্ধ করো তো!

এবার দেখলুম, জিমির যে স্বভাব এতদিন চাপা ছিল, তার বশেই সে নিশুতি রাতে বেরিয়ে পড়েছিল। একটা কিলোদশেক ওজনের মহাশের মাছ মেরে ক্ষুদে শিকারী মশায় গর্বিত মুখে ফিরছেন।

জ্যাকিও লেজ নেড়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। আমি জিমির পিঠে হাত বুলোতে গিয়ে দেখলুম জল ঝরছে। বললুম—ওরে, নিমুনি হবে যে! আয় মুছে দি। তারপর ফায়ারপ্লেসে গিয়ে আগুন জ্বালি—সেঁকে নিবি।

জিমি ড্যামকেয়ার-গোছের মাথা দোলাল। যেন বলল—আরে যাও, যাও! রাতবিরেতে জলই তো আমাদের বড় আড্ডা! ওসব ভেবোনা। বরং, গা মুছতে রাজি আছি। তার বেশি নয়।

তারপর থেকে ওকে নিশিরাতের অভিযানে যেতে আর বাধা দিতুম না। জানতুম বাধা দিলে ও মানবে না। শুধু ভয় হত সেই অজগর সাপটার কথা ভেবে। তার পাল্লায় পড়লে জিমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে তো? অবশ্য এখন শীত। সাপটা নিশ্চয় গর্তে ঘুমোতে গেছে।

সারা শীতকালটা জিমি খুব মাছ শিকার করে খাওয়াল। বসন্তের এক রাতে সে বারোটায় বেরিয়ে ফিরল একেবারে রাত তিনটেয়। উদ্বিগ্ন হয়ে দেখলুম, তার নখে, ঠোঁটে, গায়ে চাপ চাপ রক্ত। শিউরে উঠে বললুম,—এ কী রে জিমি! কী হয়েছে?

জ্যাকি খুব গর্জন শুরু করল। জিমিকে কোলে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, রক্ত জিমির নয়। অন্য কারও।

চমকে উঠলুম। এতদিন বসন্তে অজগরটার ঘুম ভেঙেছে নিশ্চয়। তাহলে কি জিমি তাকেই আক্রমণ করে বসেছিল? বললুম—

জিমি, জিমি ! কার সঙ্গে লড়াই করে এলি তুই ? এ কার রক্ত ?

জিমির নীল চোখে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল।

সেই রাতেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লুম টর্চ নিয়ে। সঙ্গে চলল জ্যাকি আর জিম। নদীর দহের কাছে গেলুম। টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলুম। হ্যাঁ, রাক্ষুসে অজগরটা রক্তাক্ত হয়ে মরে পড়ে আছে। এতদিনে জিমি তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।...

বনের ধারে একখানে বেশ ফাঁকা জায়গা সবুজ ঘাসে ভরা। শরতকালের সকাল বেলা গাছপালায় আর ঘাসে শিশির চবচব করে। তাই একটু রোদ্দুর না বাড়লে কেউ বেরোতে পারে না ওরা। যেমন ধরো – পেটমোটা উচ্চিংড়ে, মাথামোটা ডেঁয়োপিঁপড়ে, রোগাপটকা গাঙফড়িং, ডাগরডোগর লালচোখো ঘাসফড়িং আর ঘেঁটফুলের জঙ্গলে যার বাসা, সেই রঙচঙে প্রজাপতিটা! শিশিরে সব ভিজে ঢোল হয়ে যাবে না কাপড় চোপড়?

শিশির যেই শুকোল, অমনি ওরা সব এসে হাজির আড্ডা দিতে। ঘাসের মধ্যে একটা ছোট্ট ভেরেণ্ডাগাছ গজিয়েছে, তার কচি ডাল-পালাগুলোর বেগুনী রঙ দেখলে সবারই ইচ্ছে করে একবার গিয়ে বসি। ওটাই হল পোকামাকড়দের একটা ক্লাব।

এখন, আমার হয়েছে জ্বালা—আস্ত একজন মানুষ কিনা! ওদের মধ্যে হুট করে গিয়ে পড়লেই তো হল না। কার হাড়গোড় ভাঙবে, কে দলাপাকিয়ে মরে যাবে বেঘোরে খুব দেখে শুনে চলতে হয়। তার ওপর ভয় আছে—ওই মাথামোটা ডেঁয়ো পিঁপড়েটা এত বদরাগী যে কামড়ে ধরলে আর ছাড়তে চাইবে না। আমি অবশ্য একা যাইনে। ওই ফাঁকা ঘাসের জমিতে আমার আদুরে কুকুর জিম সকালে এক চক্কর গিয়ে ডিগবাজী না খেলে তার ঘুম হয় না। সারারাত সে রাগে দুঃখে গরগর করে। তাই তাকে নিয়ে যেতে হয়। তারপর কিন্তু ভেরেণ্ডা গাছটার কাছে আমি বসে পাহারা দিই, যাতে জিম ডিগবাজী খেতে খেতে এখানের আড্ডাটা না ভেঙে দেয়। কাছে এলে জিমকে তাড়িয়ে দিই। জিম তো আসল ব্যাপারটা জানে না! তাই দূরে দূরে ডিগবাজী খায় আর দৌড়াদৌড়ি করে আপনমনে।

এক সকালে হল কী, রোদে শিশির সবে শুকিয়েছে, আমি জিমকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছি। রোজকার মতো জিম খেলছে। কিন্তু ক্লাবটা যে এখনও ফাঁকা! গেল কোথায় ওরা? নাকি আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে ওরা অন্য কোথাও জায়গা বেছে নিয়েছে?

একটু পরে দেখি পেটমোটা উচ্চিংড়েটা ফুড়ুৎ করে ঘাসের ডগায় এসে বসল। তারপর ভেরেণ্ডাগাছের ডালে উঠল। তার একটু পরে উড়তে উড়তে আসছে প্রজাপতিটা। হঠাৎ জিমের নাকের ডগা পার হতেই জিম তাকে তাড়া করল। সর্বনাশ! প্রজাপতিটা প্রাণের ভয়ে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে আর জিম তার পিছনে দৌড়চ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—জিম! জিম! হচ্ছে কী? ছেড়ে দাও—ওকে ছেড়ে দাও!

দুষ্টু জিম আমার হাঁকডাক গ্রাহ্যও করল না। সে প্রজাপতিটাকে

না ধরে ছাড়বে না। প্রজাপতিটা কিন্তু ভারি চালাক। যেই জিম এক লাফ দিয়েছে, সে বোঁও করে ঘুরে একটা উঁচু কাঁটা-ঝোপের ডগায় গিয়ে বসল। তখন জিম সেখানে একটুখানি বসল। পেছনের পাদুটো গুটিয়ে যেন তাকে ধমকাতে লাগল। খবর্দার, আর কখনো বেয়াদপি করোনা, বলে দিচ্ছি।

প্রজাপতিটা মনে হল, ওকে ভেংচি কেটে জিব দেখিয়ে খুব অপমান করছে। কারণ, জিম রাগে গরগর করতে করতে আমার কাছে চলে এল।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললুম, বরং মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে জঙ্গলের খবর নিয়ে এসো না জিম! দেখে এসো তো, সেই গোমড়ামুখো বনবেড়ালটা বেরিয়েছে নাকি!

জিম অমনি লাফ দিতে দিতে বনের ভিতর ঢুকে গেল। যাক্, এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ভেরেণ্ডাগাছের আড্ডাটা দেখা যাক কেমন জমল।

দেখি হ্যাঁ—পেটমোটা ডেঁয়োপিঁপড়ে, রোগাপটকা গাঙফড়িং, ডাগরডোগর লালচোখো ঘাসফড়িং সব্বাই কখন এসে গেছে। কেবল প্রজাপতিটা তখনও দূরে কাঁটাঝোপের ডগায় ঝিম মেরে বসে রয়েছে।

ওদের মধ্যে এখন জোর গল্প চলেছে। কান করা যাক, আজ কী গল্প হচ্ছে। হুঁ উচ্চিংড়ে তার রাতের ঘটনা শোনাচ্ছে। সে বন পেরিয়ে একটা বাড়িতে হানা দিয়েছিল কাল রাতে। রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল। তখন কর্তাগিন্নিতে বেজায় ঝগড়া হচ্ছিল। কী নিয়ে ঝগড়া? ঝোলে নুন বেশি হয়েছিল যে! তা গিন্নি যখন রাগ করে শুতে গেল, উচ্চিংড়ে অমনি গিয়ে কর্তার দাড়িতে ঢুকে পড়ল। কর্তা তখন ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে দিলে! গেলুম, গেলুম! বাঁচাও, বাঁচাও! তা শুনে চাকরবাকর দৌড়ে এল। সবাই বলল, নাপিত ডাকো, নাপিত ডাকো! কর্তার দাড়িতে কী ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তক্ষুনি নাপিতও এসে গেল। যেই সে ক্ষুর বের করেছে— উচ্চিংড়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালিয়ে এল। নাপিতটা চেঁচাতে

লাগল—ধর্, ধর্, পালালো! কর্তা কেঁদে কেটে বলল, আর একটু হলেই আমার এত সাধের দাড়িগুলো চলে যেত! তা শুনে বাকি সবাই কাঁদতে লাগল, সত্যি তো! সত্যি তো! কর্তার দাড়ি গেলে সে বড় বিচ্ছিরি কাণ্ড হত! কর্তাকে আমরা আর চিনতে পারতুম না—চোর ভেবে মার লাগাতুম!

গপ্পটা শুনে সব্বাই হাসল। কেবল গাঙফড়িং হাসল না যে! বলল, যাই বলো মানুষ বড্ড দুষ্টু। আমি একটি ছোট্ট মানুষের পেণ্টুলে গিয়ে বসেছিলুম কাল, সে করল কী—আমাকে ধরে ফেলল। তারপর সুতো দিয়ে আমার লেজে ফাঁস আটকাল। উঃ, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার! ভাগ্যিস, তার হাত ফসকাল—আমি সুতোসুদ্ধ পালিয়ে এলুম। ডেঁয়োদাদার সঙ্গে পথে দেখা। সে সুতোটা কেটে না দিলে কী যে হত আমার! আর কেউ দেখতেই পেতে না আমাকে।

ঘাসফড়িং বলল, সবচেয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড আমার হয়েছিল। কাল একজন মানুষ বন্দুক নিয়ে পাখি মারতে এসেছিল। সে যেই একটা তিতিরকে তাক করেছে, আমি তার নাকের ডগায় গিয়ে বসেছি। ব্যস! তিতিরটা বেঁচে গেল। কিন্তু শিকারীটা আমাকে ধরে ফেলতে হাত বাড়াল। আমিও তক্কেতক্কে ছিলুম। উড়ে ঘাসের তলায় চলে গেলুম। শিকারীর কী রাগ তখন! সে দাঁত কিড়মিড় করে লাফাতে লাগল।

ডেঁয়োপিঁপড়ে বলল, শিকারীটার মুখে দাড়ি ছিল তো?

ঘাসফড়িং বলল, হুঁ-উ। ছিল।

গাঙফড়িং বলল, যে ছোট্ট মানুষটা আমাকে বেঁধে রেখেছিল, তার বাবার মুখেও দাড়ি ছিল।

উচ্চিংড়ে হাসতে হাসতে বলল, হয়েছে! তাহলে আমি সেই লোকটার দাড়িতেই ঢুকেছিলুম!

প্রজাপতিটা কখন এসে গিয়েছিল, লক্ষ্য করিনি। সে বলে উঠল, আরে বলোনা, বলোনা! সেই লোকটারই কুকুর একটু আগে আমাকে যা জ্বালিয়েছে না!

হঠাৎ ডেঁয়োপিঁপড়ের চোখ গেল আমার দিকে।

সে চাপা গলায় বলে উঠল, কী সর্বনাশ! ওই তো সেই লোকটা! ওই তো ওর মুখে দাড়ি!

সব্বাই আমার দিকে তাকাল। গাঙফড়িং বলল, পালাও পালাও! ঘাসফড়িং বলল, পালাও!

প্রজাপতি বলল, পালাও! উচ্চিংড়ে বলল, পালাও! তক্ষুনি সব্বাই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। ডেঁয়োপিঁপড়েটা ভেরেণ্ডার ডাল থেকে তরতর করে নেমে আসছে দেখতে পেলুম। আমি ওর মতলব টের পাচ্ছিলুম। ও যদি আমার জুতো প্যান্ট জামা দিয়ে উঠে সটান দাড়িতে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে! তাই আমিও সরে এলুম তক্ষুনি। তারপর কাল যা যা হয়েছিল, ভাবতে লাগলুম।

হ্যাঁ, আমার ছেলে রণি একটা গাঙফড়িং ধরেছিল বটে! সন্ধ্যা-বেলায় ঝোলে নুন নিয়ে রণির মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও করেছিলুম। তারপর আমার দাড়িতে কী একটা ঢুকে পড়েছিল, তাও ঠিক। আর—হ্যাঁ! বিকেলে নদীর ধারের জঙ্গলে একটা তিতির মারতে গিয়ে আমার নাকে একটা ঘাসফড়িং বসেছিল, যার ফলে গুলি ছোড়া হয়নি। নাকের ওপর কিছু হামলা করলে সব শিকারীর মেজাজই খিঁচড়ে যায়।

ওরা তাহলে আমাকে নিয়ে খুব রসিকতা করল বটে! আমার রাগ হল। রেগে ভেরেণ্ডা গাছটা উপড়ে ফেলতে যাচ্ছি, হঠাৎ জিম দৌড়ে চলে এল। আমার দু'পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ঢুকতেই টের পেলুম, নির্ঘাৎ জঙ্গলে কোন ভয়ঙ্কর কিছু দেখে ভয় পেয়েছে! তারপর একটা বাঘের ডাক শুনলুম। সর্বনাশ! এখন যে হাতে বন্দুক নেই! তাই জিমকে কাঁধে তুলে পা টিপে টিপে পালিয়ে গেলুম। কিন্তু পোকামাকড়গুলো সত্যি যে এত দুষ্টু হয়, তা তো জানতুম না!

আষাঢ় মাস। কিন্তু একেবারে বৃষ্টি নেই। খটখটে রোদ্দুর। মাঠঘাট পুড়ে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দুপুর বেলা তাই চার বন্ধু বেরিয়ে পড়েছে। হাবলু, ভোঁদা, ন্যাড়া আর পুঁটু। যাবেই বা কোথায়? পাড়াগাঁর ছেলে সব। ইস্কুলের মাঠে তো ঠাঠা রোদ্দুর! খেলে সুখ নেই তাই গেছে মল্লিকদের আমবাগানে।

সেখানে ঘন ছায়া। পাখপাখালি ডাকছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। চার ছোট্ট বন্ধু খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে আমগাছের

ছায়ায় বসেছে। কেউ হাই তুলছে। কেউ শুয়েও পড়েছে। মালী-বুড়ো থাকলে তাড়া করত! ভাগ্যিস নেই। বাগানের সব আম জষ্টিমাসেই পাড়া হয়ে গেছে। তাই সে ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

একটু পরে হাবলু হঠাৎ ফিক করে হেসে বলে উঠল – কাঁচা আম নুনলংকা দিয়ে ছেঁচে খেতে ইচ্ছে করছে রে! এখন তো মালীবুড়ো নেই। যদি গাছে আম থাকত, কী মজা না হত!

ভোঁদা আমের নামে জিভে জল এনে বলল – আহা!

পুঁটে জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল – হে ভগবান! একটা আম মিলিয়ে দাও!

ন্যাড়া ঢুকছিল। চোখ খুলে বলল – কই আম? কোথায় আম?

ভোঁদা বলল – তোর মাথায়। শোন্, এক কাজ করি আমরা। চারজন মিলে গাছগুলো খুঁজে দেখি। পাতার আড়ালে দু-একটা কি থেকে যায়নি?

ওরা সবাই উঠে দাঁড়াল। মল্লিকদের বাগান তোলপাড় করে আম খুঁজতে ব্যস্ত হল। বাগানটা বেশ বড়। চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার চোখের দৃষ্টি গাছের ডালপালায়।

হঠাৎ ভোঁদা কোনার দিকের একটা গাছতলা থেকে চেঁচিয়ে উঠল – পেয়েছি! পেয়েছি! ওই যে একটা আম!

বাকি তিনজনে সেখানে দৌড়ে গেল। দেখল, হ্যাঁ – সত্যি একটা কাঁচা আম পাতার ফাঁকে ঝুলছে। সবাই মিলে তখন ঢিল ছুঁড়তে থাকল!

অনেক ঢিল ছোড়ার পর আমটা পড়ল ন্যাড়ার ঢিলে। কিন্তু যেখানে পড়ল, সেখানে ঝোপ-ঝাড়। তাই আমটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চারজনে ঝোপে ঢুকে খুঁজছে। হঠাৎ পুঁটে চেঁচিয়ে উঠল – পেয়েছি! পেয়েছি!

আমটা নিয়ে ওরা ফাঁকায় এল। কিন্তু তারপরই পুঁটে গোঁ ধরে বসল। সে বলল – আমটা আমি যখন কুড়িয়েছি, তখন এটা আমি একা খাব।

ন্যাড়া লাফিয়ে উঠে বলল—খবর্দার! আমার ঢিলে পড়েছে। ওঠা আমারই পাওনা।

তখন ভোঁদা হুংকার দিয়ে বলল—কী? আমটা আমিই তো দেখেছিলুম! আমি না দেখলে তোরা কোথায় পেতিস শুনি? অতএব ওটা আমিই পাব।

হাবলু বেগতিক দেখে বলল—বাঃ! আম খাবার কথা আমি না তুললে তোরা আম খুঁজতে বেরোতিস? ওটা আমার।

ব্যস্! চার ছোট্ট বন্ধু মিলে ঝগড়া বেধে গেল। প্রত্যেকেই আমটার ওপর দাবি জানাচ্ছে। প্রায় ঘুষোঘুষির উপক্রম। এমন সময় হাবলুর দাদা ডাবলুবাবু সেখানে হাজির। ধমক দিয়ে বললেন—কী রে? সব ভূতের মতো লম্ফঝম্ফ করছিস কেন?

চার বন্ধু মিলে একসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইল।

ডাবলুবাবু ফের ধমক দিয়ে বললেন—চোপ্! কই, আমটা আমার হাতে দে। তারপর যে যার কথা, একে একে বল।

হাবলু বলল—আম খাবার কথা আমিই তুলেছিলুম, দাদা। তাই............

ডাবলুবাবু আমে এক কামড় দিয়ে বললেন—বুঝেছি। এবার ভোঁদা বল।

ভোঁদা বলল—আমটা আমি দেখেছিলুম দাদা। তাই.........

ডাবলুবাবু আমে কামড় দিয়ে বললেন—হুম্। এবার ন্যাড়া বল্।

ন্যাড়া বলল—আমটা আমিই পেড়েছিলুম দাদা। ওটা.........

ডাবলুবাবু আমে আবার কামড় দিয়ে বললেন—বেশ! এবার পুঁটে বল্।

পুঁটে করুণ মুখে বলল—আমটা আমি খুঁজে পেয়েছিলুম যে!

—তাই নাকি? বলে ডাবলুবাবু আমের আঁটিটা চুষতে চুষতে চলে গেলেন। চার ছোট্ট বন্ধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

———